মজলিসে দাওয়াতুল হক কী ও কেন?

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

২৬শে জানুয়ারি ২০১৬ ইং (বুধবার), রংপুর জুম্মাপাড়া মাদরাসায় দাওয়াতুল হকের মহাসম্মেলনে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ফিকিরের সারনির্যাস 'মজলিসে দাওয়াতুল হকে'র পরিচয়, প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন. হযরতওয়ালা থানবী রহ. এর গবেষণা ও অনুসন্ধানে উম্মতের তৃতীয় যে সমস্যাটি ধরা পড়ল তা হল, উম্মতের কোন আমলের মধ্যে পূর্ণ সুন্নাত তরীকার পাবন্দী নেই। উদাহরণত নামাযে ৫১টি সুন্নাত আছে। খোঁজ নিলে আমাদের নামাযে হয়তো ২০/৩০টি পাওয়া যাবে। আর বাকী সুন্নাতগুলো আমাদের নামাযে অনুপস্থিত। অথচ সুন্নাতবিহীন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

নামাযে হাত উঠানো ও পা রাখা এবং মুনাজাতে হাত উঠানোর সুন্নাত তরীকা

কিছু উদাহরণ নিন। সুন্নাত হল তাকবীরে তাহরীমার সময় কান বরাবর হাত তুলতে হবে, হাতের তালু কিবলামুখী থাকবে, আঙ্গুলগুলো আকাশমুখী থাকবে। যারা সাধারণ মানুষ তারা তো তারাই, যাদেরকে মুত্তাকী পরহেযগার মনে করা হয় তারাও আঙ্গুলগুলোকে সাপের ফনার মত বানিয়ে হাত উঠায়। আবার কেউ কেউ হাতের তালু গালের দিকে করে রাখে, এটাও সুন্নাতের খেলাফ।

নামাযে দাঁড়ানোর সময় দু'পা পুরোপুরি কেবলার দিকে করে রাখতে হয়। কিন্তু ক'জন এভাবে পা রাখে? বেশিরভাগ নামাযীই দুই পা দু'দিকে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী করে রাখে। এবার শেষ থেকে একটা বলি। মুনাজাতে হাত ওঠানোর সুন্নাত তরীকা হল, হাত সিনা বরাবর ওঠাবে, তালু আসমানের দিকে থাকবে, দুই হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা থাকবে। অথচ আমরা কেউ দুই হাত পুরোপুরি মিলিয়ে দেই, আবার কেউ অনেক বেশি ফাঁকা করে রাখি, কেউ পেটের উপরে হাত রাখি, কেউ রাখি নমস্কারের সুরতে, আবার কেউ রশি পাকাই! বলুন, ঠিক না বেঠিক? এগুলো সুন্নাতের বরখেলাফ।

মুনাজাত শুরু ও শেষ করার সুন্নাত তরীকা

দেখুন, সঠিক সুন্নাত না জানার কারণে উম্মতের নামাযে এতোগুলো গলদ তরীকা চালু হয়ে গেল। সুন্নাত হল, মুনাজাত শুরু হবে হামদ ও দুরূদের মাধ্যমে। আমরা শুরু করি 'আল্লাহুম্মা আমীন' এর মাধ্যমে। আল্লাহুম্মা আমীন দ্বারা তো মুনাজাত শেষ করতে হয়। যার দ্বারা মুনাজাত শেষ করবেন সেটা আগে আনলেন কেন? আর মুনাজাত শেষ করতে হবে হামদ, দুরূদ ও আমীন দ্বারা। অথচ আমরা শেষ করি 'বেহাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু...' দ্বারা।

মুহতারাম! সন্দেহ নেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু... সবচেয়ে দামী কালিমা। কিন্তু তা কোন বিশেষ স্থানে পড়তে হলে তো হাদীসের দলীল লাগবে। ধরুন, কেউ টয়লেটে প্রবেশ করার দু'আ হিসেবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু... পড়ল। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আরে ভাই কী পড়লেন? উত্তরে সে বলল, কেন কোন খারাপ কালিমা পড়লাম নাকি? না ভাই এটা ভাল কালিমা, কিন্তু টয়লেটে প্রবেশের জন্য তো হাদীসে ভিন্ন দু'আর কথা আছে।

এখানে শুধু নামাযের শুরু ও শেষের দুয়েকটা ভুল নিয়ে আলোচনা করা হল। পুরো নামাযে তো অনেক ভুল রয়েছে যা এত বড় মজলিসে হাতে-কলমে দেখানো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরীল আমীন আ.-এর মাধ্যমে দুই দিন দশ ওয়াক্তে দশ বার নামায দেখিয়েছেন। (আবু দাউদ শরীফ: হাদীস নং ৩৯৩) তো নবীজীকে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নামায শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা কতবার নামাযের মশক করেছি, কতবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি? আমাদের তার তাওফীক হয়নি।

হযরত থানবী রহ. উম্মতের তিন নম্বর সমস্যা দেখলেন, আমাদের মধ্যে সুন্নাতের আমল পরিপূর্ণভাবে নেই। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি উলামায়ে কেরামের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন, তাদেরকে নিত্যপালনীয় সুন্নাতসমূহের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে বললেন। কারণ সংস্কারের কাজ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। দীনী সংস্কার ও সুন্নাত পুনরুজ্জীবনের মহান কাজ শুধু মুহাক্কিক আলেমগণই করতে পারেন। তাবলীগের কাজ তো আলেম, গায়রে আলেম সবাই নিজ নিজ ইলম ও জ্ঞান অনুপাতে করতে পারবে। কারণ সেখানে নির্দিষ্ট ছয়টি বিষয়ের উপর আলোচনা সীমিত থাকে। কিন্তু দাওয়াতুল হকের কাজ শুধু বিদগ্ধ ও অনুসন্ধিৎসু আলেমগণই করতে পারবেন। কারণ কোন ব্যাপারে বাহ্যিকভাবে বিপরীতমুখী একাধিক আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনটির ওপর আমল করা সুন্নাত ও উত্তম হবে গবেষণা করে তা বের করতে অনেক ইলম দরকার। বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ কিংবা দু-চারটে বাংলা/ইংরেজী তাফসীর পড়ে এটা বের করা অসম্ভব। বস্তুত দাওয়াতুল হকের কাজটি উলামায়ে কেরামের শান ও মান অনুযায়ী একটি বিরাট দীনী খিদমত। তাছাড়া হাদীস শরীফে গোরাবাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যারা নবীজীর বিগড়ে যাওয়া সুন্নাতসমূহ সংশোধন করে দেয়। বলুন তো, বর্তমান বিশ্বে কোন কোন জামাআত এই কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছে? উলামায়ে কেরামের ধারণা, তুলনামূলক এ খিদমতটি বেশি আঞ্জাম পাচ্ছে মজলিসে দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে।

চার. হযরত থানবী রহ. উম্মতের মধ্যে চতুর্থ যে সমস্যাটি লক্ষ্য করলেন তা হল, মুনকারাত তথা শরীয়ত যে কাজগুলোকে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী সাব্যস্ত করেছে এগুলোর তা'লীম ঠিকমত দেয়া হচ্ছে না। সবাই শুধু করণীয় ও ইতিবাচক কাজগুলোর কথা বলছে। বর্জনীয় ও নেতিবাচক বিষয়গুলো কেউ খুলে খুলে বলছে না যে, এগুলো কবীরা গুনাহ, এগুলো হারাম, এগুলো মাকরূহে তাহরীমী।

কয়েকটি কবীরা গুনাহ

উদাহরণস্বরূপ, একজন ল্যাংড়া ব্যক্তিকে ল্যাংড়া কিংবা কানা ব্যক্তিকে কানা বলে

ডাকা যে কবীরা গুনাহ আপনারা তা জানেন? দু-একজন ছাড়া কারও এ ব্যাপারে খবর নেই। এমন বহু গুনাহ আছে যেগুলোর গুনাহ হওয়ার ব্যাপারেই আমরা বিলকুল অজ্ঞ।

দাড়ি রাখা ওয়াজিব, কিন্তু চেঁছে ফেলা বা চার আঙ্গুলের চেয়ে খাটো করা হারাম। অনেকে দাড়ি রাখাকে আইনগত সুন্নাত মনে করে এ ব্যাপারে অলসতা করছে। অথচ নবীর আদর্শ হিসেবে দাড়ি রাখাকে আভিধানিক অর্থে সুন্নাত বলা গেলেও আইনগতভাবে তা ওয়াজিব। ঠিক যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াকে নবীর আদর্শ হিসেবে আভিধানিক অর্থে কেউ সুন্নাতও বলতে পারে কিন্তু তার আইনগত পজিশন হল ফরয এবং শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া নামায তরক করা কবীরা গুনাহ– হারাম।

অনুরূপ বর্তমানে বিবাহ-শাদীতে ছেলে পক্ষ মেয়ের পিতার সঙ্গে এরূপ শর্ত করে যে, আমাদের দু'শো মেহমানকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, মুসলমানের বিয়েতে শরীয়ত দুটি খাতে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দিয়েছে। মহর ও ওলীমা। আর এ দু'টি খরচই ছেলের দায়িত্বে। বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে শরীয়ত মেয়ের অভিভাবকের যিম্মায় কোন ধরণের খরচের দায়-দায়িত্ব চাপায়নি। এমনকি মেয়েকে বিদায় দিতে মেয়ের বাড়িতে তার যে সব আত্মীয়-স্বজন আসবে এ সময় তাদেরকে আপ্যায়ন করাও মেয়ের অভিভাবকের দায়িত্ব নয়। প্রয়োজনে এসকল আত্মীয়-স্বজন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খানা-পিনা নিয়ে আসবে। কারণ, এই মেয়েকে তার অভিভাবক ১৫/১৬ বছর ধরে লালন-পালন করে বড় করেছে। তার জন্য অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করেছে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা অভিভাবকের যিম্মায় মেয়ের বিবাহে উল্লেখযোগ্য কোন খরচ রাখেননি। সুতরাং বিবাহ উপলক্ষে মেয়ের বাড়িতে এ ধরনের দাওয়াত খাওয়া বৈধ নয়। আমার শায়খ হযরতওয়ালা আবরারুল হক রহ. এর দলীল স্বরূপ নবীজীর এই হাদীসটি পাঠ করতেন, دخل سارقا وخرج مغيرا

অর্থ : সে চোর হয়ে ঢুকল, আর ডাকাত হয়ে বেরল। (সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ১৪৫৪৯)

এখন বলুন! এক ওয়াক্ত খানা খাওয়ার বিনিময়ে কে কে ডাকাত আর চোর হতে চান? খবরদার! অতীতে যা হয়েছে তার জন্য তওবা করুন। ভবিষ্যতে না খাওয়ার পাক্কা এরাদা করুন। কত জঘন্য ব্যাপার! খানা খেলেন এক বেলা, আর নবীজীর পক্ষ হতে সার্টিফিকেট মিলল দু'টি; চোর আর ডাকাত। সুতরাং এরূপ হারাম খানা অবশ্যই পরহেয করুন।

তবে বিয়ের সময় ছেলের বাড়িতে তার সাধ্য অনুযায়ী (অপচয়, অপব্যয়, লোক দেখানো ও উপঢৌকন অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং গোনাহমুক্তভাবে) দাওয়াতের ব্যবস্থা করা সুন্নাত, যেটাকে ওলীমা বলা হয়। এতে অংশগ্রহণ করা জায়েয; বরং নবীজীর সুন্নাত।

মসজিদে গুনাহে কবীরা সংবলিত কিতাবের তা'লীম করা জরুরী

কাজেই প্রতিটি মসজিদে গুনাহে কবীরার আলোচনা সংবলিত কিতাব তা'লীম করতে হবে। জনসাধারণকে জানাতে হবে যে, এটা হালাল, এটা হারাম, এটা জায়েয, এটা নাজায়েয। ইলম না থাকায় মানুষ আজ হাসতে হাসতে গোনাহ করছে। যখন মুনকারগুলোর তা'লীম চালু হবে, ইনশাআল্লাহ মুমিন ব্যক্তি তার অন্তরে বিদ্যমান খোদাভীতির কারণে এসব গোনাহে জড়িত হবে না।

আমি যে গুনাহে কবীরার কথা বললাম যদি কেউ এর কোনটাকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হয় তাহলে তার ঈমান থাকবে না। আর যদি গোনাহকে হারাম মনে করে তাতে লিপ্ত হয় তাহলে তার ঈমান নষ্ট হবে না বটে, কিন্তু সে ফাসেক সাব্যস্ত হবে। তাকে গুনাহগার মুমিন বলা হবে।

হারামকে হালাল মনে করলে ঈমান থাকে না

বলুন, কেউ মদ খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়লে তার ঈমান থাকবে? থাকবে না। আজকাল সাধারণ দোকানেও ভিন্ন নামে মদের বেচা-বিক্রি চলছে। মদ এখন 'এনার্জি ড্রিংক'-এর লেবেলে বাজারজাত করা হচ্ছে। এগুলো পান করবেন না। এগুলোর মধ্যে মদ আছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন নামে 'মদ' চালু হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৮৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৪০২০) এটা তারই নমুনা।

প্রচলিত জমি বন্ধক সুদী লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত

গ্রামাঞ্চলে জমি বন্ধকের একটা পদ্ধতি আছে। ঋণগ্রহিতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত ঋণদাতা বন্ধকী জমিতে চাষাবাদ করে বা অন্য কোন উপায়ে জমি দ্বারা উপকৃত হতে থাকে। এ পদ্ধতির বন্ধকী লেনদেন হারাম এবং ঋণদাতার উৎপাদিত ফসল ও উপার্জন সুদ। হ্যাঁ বন্ধকী লেনদেন জায়েয আছে। কারণ এতে প্রদত্ত ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এর বৈধ সুরত হল, কাউকে ঋণ দিয়ে তার জমির দলীল বন্ধক রাখবেন আর জমি তার মালিককেই ভোগ করতে দিবেন। এতে আপনার দেয়া ঋণের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে এবং বন্ধকটাও সহীহ হবে। পাশাপাশি ঋণ দেওয়ার কারণে আপনি সাওয়াবও পাবেন। কোন কোন হাদীসে সাধারণ দানের চেয়ে ঋণ দেওয়ার সওয়াব ১৮ গুণ এবং কোন কোন হাদীসে ২০ গুণ বেশি সওয়াব বলা হয়েছে। (ত্বাবারানী কাবীর; হা.নং ৭৯৭৬)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل قرض جر نفعا فهو ربوا

অর্থ : ঋণের বিপরীতে অর্জিত সর্বপ্রকার লাভ সুদ বলে গণ্য। (শরহু মাআনিল আসার; হা.নং ৫৭৩৫)

উদাহরণত এক বন্ধুকে ২০,০০০/- টাকা ঋণ দিলেন। ইতোপূর্বে কোনদিনও সে আপনার বাড়িতে বাজার-সদাই পাঠায়নি, মিষ্টি-মিঠাই পাঠায়নি। কিন্তু ঋণ দেয়ার পর এখন মাঝে-মধ্যে পাঠাচ্ছে। বুঝতে হবে এটা সুদ। তবে পূর্ব থেকেই যদি এ জাতীয় উপহার-উপঢৌকন পাঠানোর অভ্যাস তার থাকে অতঃপর ঋণ নেয়ার পরও তা জারী রাখে তাহলে তা জায়িয হবে, সুদ হবে না। এখন বলুন, এগুলো জানার দরকার আছে কিনা? এই যে ওয়ায মাহফিল হচ্ছে এর উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হল, আমরা হক্কানী উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে দীনী বিষয়াদি শিখব এবং নিজেদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো জেনে আমাদের যিন্দেগী সংশোধন করে নেবো। কিন্তু অধিকাংশ মাহফিলে এগুলোর আলোচনা না হওয়ায় ভুল তো থেকেই যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি রহম করুন।

পাঁচ. হযরতওয়ালা থানবী রহ. পঞ্চম যে সমস্যাটি লক্ষ্য করলেন তা হল, মু'আমালাত ও মু'আশারাত অর্থাৎ লেনদেন ও সামাজিকতা তথা হুকূকুল ইবাদ সম্পর্কে উম্মতের সীমাহীন গাফলত। তিনি দেখলেন, উম্মত অগণিত ভুলভ্রান্তি এবং বহুরকম প্রান্তিকতা সত্ত্বেও ঈমান ও ইবাদাতকে অন্তত দীন মনে করে। কিন্তু সাধারণ উম্মত তো দূরের কথা, দীনদার হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গও মু'আমালাত মু'আশারাতকে দীন ও শরীয়তের অংশই মনে করে না এবং এগুলোর মাসআলা জানার ব্যাপারে গুরুত্বই দেয় না।

এ প্রসঙ্গে জনৈক আলেমের ঘটনা

একবার হযরত থানবী রহ. এর জনৈক আলেম খলীফা স্বীয় সন্তানসহ হযরতের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। তিনি আলেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, রেলগাড়িতে বাচ্চাটির জন্যও টিকেট করা হয়েছিল কিনা? আলেম সাহেব জবাব দিলেন, জী, হ্যাঁ। থানবী রহ. দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, ফুল টিকেট না হাফ টিকেট? আলেম বললেন, হাফ টিকেট। থানবী রহ. প্রশ্ন করলেন, ওর বয়স কত? আলেম সাহেব বললেন, বারো বছর। থানবী রহ. প্রশ্ন করলেন, বারো বছরের বাচ্চার জন্য তো ফুল টিকেট করার আইন। আলেম সাহেব উত্তরে বললেন, ফুল টিকেট কাটার বয়স হওয়া সত্ত্বেও দেখতে ছোট হওয়ায় তার জন্য ফুল টিকেট করা হয়নি। হযরত থানবী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, দেখতে ছোট হলে বারো বছরের বাচ্চার জন্য হাফ টিকেট করা যাবে এমন আইন কোথায় পেলেন? আলেম সাহেব কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তখন হযরত থানবী রহ. অত্যন্ত গোস্বা হলেন, এমনকি উক্ত ব্যক্তির খেলাফত কেটে দিয়ে তাকে খানকা থেকে বের করে দিলেন এবং বললেন, তোমার শরীরে তো তাসাওউফের বাতাসও লাগেনি।

লেনদেন ও বান্দার হকের গুরুত্ব

নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষ প্রচুর পরিমাণে সাওয়াব অর্জন করে থাকে। আর মু'আমালাত মু'আশারাত সেই সাওয়াবসমূহকে সঠিকভাবে হেফাজত করে। মানুষ ইবাদাতের মাধ্যমে পাহাড় পরিমাণ সাওয়াবের অধিকারীই হোক না কেন, যদি তার মু'আমালাত ও মু'আশারাত ঠিক না থাকে তাহলে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কিয়ামতের দিন সে হবে সবচেয়ে গরীব, সবচেয়ে নিঃস্ব। অবৈধ উপার্জনের কারণে বা কারো হক অনাদায়ী থাকার অপরাধে তার সওয়াবগুলো পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। আর তাকে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্য হযরত থানবী রহ. এ ব্যাপারটিকে উম্মতের সামনে যথাযথ মর্যাদায় তুলে ধরা জরুরী মনে করলেন। হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর সামনে সমস্যা তো অনেক ছিল কিন্তু এই পাঁচটি এমন মৌলিক সমস্যা যেগুলোর প্রতি কেউ ভালোভাবে খেয়াল করছিল না।

মজলিসে দাওয়াতুল হকের ভিত্তিস্থাপন

সমস্যাগুলো নির্ণয়ের পর হযরত থানবী রহ. তার খলীফাদেরকে ডেকে বললেন, এই পাঁচটি সমস্যার দিকে কেউ ভালোভাবে খেয়াল করছে না। আমি এগুলো ঠিক করার জন্য একটি মেহনত চালু করতে চাই, তোমরা এর একটি নাম ঠিক কর। বিভিন্নজন বিভিন্ন নাম পেশ করলেন। মাওলানা আব্দুল গনী ফুলপুরী রহ. বললেন, হুযূর! এর নাম 'দাওয়াতুল হক' হলে ভাল হয়। অতঃপর এর সমর্থনে তিনি কুরআনে কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করলেন- 'লাহু দা'ওয়াতুল হক'। হযরত থানবী রহ.-সহ উপস্থিত সকলে নামটি পছন্দ করলেন। নাম নির্ধারণের পর হযরত থানবী রহ. তার খলীফাদেরকে বললেন, তোমরা যারা যারা এই কাজ করতে আগ্রহী তারা নাম লেখাও এবং প্রত্যেক এলাকায় হালকা বা কমিটি বানিয়ে কাজ শুরু করে দাও। ব্যস, এভাবেই শুরু হল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং মুখলিসানা একটি দীনী মেহনত। মজলিসে দাওয়াতুল হক হল হযরত থানবী রহ.-এর সারা জীবনের খোলাসা, সারাংশ ও নিচোড়। অতঃপর তার খলীফারা যে যে দেশে এবং যে যে এলাকায় ছিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের নিজ নিজ এলাকায় এই কাজ চালু করে দিলেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল।

ঢাকায় দাওয়াতুল হকের কাজের সূচনা

আমাদের দেশেও ঠিক তা-ই হল। ঢাকায় আমার উস্তাদ ও প্রথম শাইখ হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এই কাজটা ধরে রেখেছিলেন। তার ওখানে প্রতি সপ্তাহে মালফূযাত তা'লীম হতো, কিরাআত মশক হতো এবং এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জায়গায় কুরআনী মকতবও চালু হয়েছিল। তিনি ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কুরআনী মকতব কায়েমের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতুল হকের আন্দাযে ছোট ছোট মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো।

হারদুয়ী হযরত ও করাচী হযরতের ঢাকা আগমন

যিন্দেগীর শেষ দিকে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. লক্ষ্য করলেন, তার হায়াত তো শেষ পর্যায়ে, কিন্তু হাকীমুল উম্মতের খলীফাদের মধ্যে সারা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতিতে কাজ করার লোক নেহায়েত কম। এ সময় তিনি এক হজ্জের সফরে আমার দ্বিতীয় শাইখ, হযরত মাও. শাহ সায়্যিদ আবরারুল হক রহ.-কে এবং তাঁর খলীফা হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.-কে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দিয়ে আসলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমিতো বুড়ো হয়ে গেছি, আমার পক্ষে দৌড়ঝাঁপ করা অত্যন্ত কঠিন। আপনারা মাশাআল্লাহ শক্ত-সামর্থ্য আছেন, আপনাদের দুজনকে আমার বাংলাদেশে আসতে হবে এবং দাওয়াতুল হকের কাজ ওঠানোর দায়িত্ব নিতে হবে।

আল্লাহর মেহেরবানীতে উভয় বুযুর্গ দাওয়াত কবুল করলেন। হজ্জের কিছুদিন পর প্রথমে করাচী হতে হযরত হাকীম আখতার সাহেব রহ. বাংলাদেশে আগমন করলেন। এ সফরে তিনি লালবাগ মাদরাসায় অবস্থান করেছিলেন। সে সময় আমি তার খাদেম ছিলাম। বাঁধানো দাঁত খুলে তাকে মিসওয়াক করানো, মাথায় তেল দিয়ে দেয়া ইত্যাদি খিদমত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিছুদিন পর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.ও প্রথমবার বাংলাদেশে তাশরীফ আনলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। যা সমসাময়িক বড় বড় উলামায়ে কেরাম কর্তৃক স্বীকৃত।

হাফেজ্জী হুযূরের শেষ নির্দেশ

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. তার প্রতিষ্ঠিত নূরিয়া মাদরাসার খানকায় এই দুই বুযুর্গকে সামনে রেখে আমরা যারা তার মুরীদ ছিলাম- নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমার এই পীর ভাই (মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ.) অথবা তাঁর এই খলীফা (আরেফ বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.)-এর হাতে মুরীদ হয়ে যাও। আমি হয়তো বেশিদিন দুনিয়াতে থাকব না। আমি তোমাদেরকে এই দুই বুযুর্গের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। হযরত হাফেজ্জী রহ.-এর নির্দেশে তারই খানকায় এই দুই বুযুর্গের মধ্যে যাকে যার মুনাসিব মনে হয়েছিল আমরা তার হাতে বাইআত হয়ে গেলাম।

হারদুয়ী হযরতের বাংলাদেশ সফর জারী হয়ে গেল এবং দাওয়াতুল হকের কমিটি ঢেলে সাজানো হল

কিছুদিন পর হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ইন্তেকাল হয়ে গেল। এই দুই বুযুর্গেরও বাংলাদেশে আসা-যাওয়া চালু হয়ে গেল। হযরতওয়ালা হারদুয়ী রহ. বাংলাদেশের দ্বিতীয় সফরে ধানমণ্ডির হাজী হাবীবুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে আমাদেরকে সমবেত করে বললেন, তোমরা থানাভিত্তিক ভাগ হয়ে যাও। ঢাকায় যতগুলো থানা আছে সে অনুযায়ী

আলাদা আলাদা বসো। আমরা সেভাবে ভাগ হয়ে বসলাম। তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন, ভাগ তো হলে, এখন নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী একজনকে থানা আমীর আর দু-একজনকে নায়েবে আমীর বানাও। আমরা সেভাবেই করলাম। এরপর হযরত হারদুয়ী রহ. নিজে হযরতুল আল্লাম, শাইখুল হাদীস, আল্লামা মাহমুদুল হাসান দা.বা.-কে থানা আমীরদের আমীর বানিয়ে দিলেন। আমরাও সর্বসম্মতিক্রমে তা মেনে নিলাম। হযরতওয়ালা আমাদের কামিয়াবীর জন্য ভরপুর দু'আ করলেন।

মজলিসে দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

তারপর তিনি বললেন, তোমরা এখন কাজ শুরু কর। তোমাদের কাজ হল,

১. তোমাদের নিজ নিজ থানার কোন একটা মসজিদকে দাওয়াতুল হকের মারকায বানাবে। সেখানে 'মাসিক ইজতিমা' হবে। এ ইজতিমায় সুন্নাতের ওপর কিছু বয়ান হবে, বাকী সময় সুন্নাতের আমলী মশক হবে।

২. যারা সদস্য হবে তাদেরকে নিয়ে সেখানে 'মজলিসে আরাকীন' নামে একটা মাসিক মজলিস হবে। উক্ত মজলিসে আরাকীনে সিদ্ধান্ত হবে কোথায় কোথায় প্রোগ্রাম করা হবে, কে কে বয়ান করবে। উক্ত মজলিসে নিজেদের মধ্যে পরস্পরে মশক ও মুযাকারা করবে।

৩. কমিটির পক্ষ থেকে প্রতি থানায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে মাসে মোট চারটি 'গাশতী মাহফিল' হবে। এই মাহফিল কোন মসজিদে, কারো বাড়িতে, কোন কাচারীতে বা স্কুলেও করা যাবে। মোটকথা যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় সেখানেই করতে পারবে। গাশতী মাহফিলে সুন্নাতের ওপর কিছুক্ষণ বয়ান হবে, তারপর আমলী মশকের ব্যবস্থা করবে। তবে এসব মাহফিলে কোন প্রকার খানা-পিনা, চা-নাস্তার ব্যবস্থা থাকবে না। দাওয়াত খাওয়া সুন্নাত বটে, তবে কাজের সুবিধার্থে সেটা মাহফিলের সাথে না হয়ে ভিন্নভাবে হবে।

৪. বছরে ২/৩ বার মারকাযে খাছভাবে উলামায়ে কেরামের মজলিস

করবে। সেখানে আলেমদের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে মুযাকারা হবে এবং নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, কমি-খামী দূর করার ফিকির করবে।

৫. এলাকার সকল মসজিদে ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে ঈমান-আকীদার কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব ও 'এক মিনিটের মাদরাসা' নামক কিতাবের তা'লীম চালু করবে।

৬. প্রয়োজনীয় স্থানে ফুরকানিয়া বা নূরানী মকতব কায়েম করবে। এসব মকতবে শিশুরা এবং দিনের কোন একসময় বয়স্করা কুরআন শিখবে এবং দীনের জরুরী মাসআলা ও সুন্নাতসমূহ শিক্ষা করবে।

৭. সকল বড় মাদরাসায় উলামায়ে কেরাম, হুফ্ফায ও কারীদের কুরআন সহীহ করার জন্য 'তাকমীলে তাসহীহ' নাম দিয়ে কুরআন শিক্ষা বিভাগ খুলবে।

৮. রমযানে হাদিয়া ছাড়া খতম তারাবীহ পড়ানোর জন্য হাফেয সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

৯. সুন্নাত তরীকায় বিবাহ-শাদী, সুন্নাত তরীকায় কাফন দাফন, লেনদেন ও বান্দার হকের মাসআলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

১০. খিদমতে খালকের দায়িত্ব অঞ্জাম দিবে। অর্থাৎ কোন এলাকায় বিপদ-আপদ দেখা দিলে তাদের খেদমতের জন্য প্রয়োজনীয় সামান নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবে।

হারদুয়ী হযরতের বাতানো এই নকশার উপর কাজ শুরু হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় মুরুব্বীরা তাদের সময় সুযোগ মতো জেলায় জেলায় ও থানায় থানায় সফর করে উক্ত নিয়মে কমিটি করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় এ পদ্ধতিতে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এখন সকল আলেম ও দীনদার লোকদের দায়িত্ব হলো বিলম্ব না করে এ নিয়মে দাওয়াতুল হকের কাজ শুরু করে দেয়া

আপনারা যারা এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন আপনারাও নিজ নিজ এলাকায় মজলিসে দাওয়াতুল হকের হালকা বা কমিটি গঠন করে নিন। আর এতক্ষণ যেভাবে বললাম হালকাগুলোতে এভাবে মেহনত চালু করে দিন। মনে রাখবেন, দাওয়াতুল হক সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দাওয়াতী মেহনত। কাজেই এ ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবেন। এটিকে রাজনৈতিক স্টাইলে মিটিং-মিছিল, লাঠি-সোটা, লংমার্চ, রোডমার্চ-এর মাধ্যমে করা যাবে না।

তাবলীগী মেহনত থাকতে এ মেহনতের কী প্রয়োজন?

কেউ কেউ বলতে পারেন, হুযূর! তাহলে 'তাবলীগ জামাআত'-এর কাজটা কী? তাবলীগী জামাআত থাকতে মজলিসে দাওয়াতুল হকের প্রয়োজন কী? এর উত্তর হল, দাওয়াতুল হক ও দাওয়াতে তাবলীগ এই দু'টোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং তেমন কোন পার্থক্যও নেই। বিষয়টি ভালভাবে বুঝুন, মালফূযাতুশ শাইখ নামক কিতাবে আছে,

তাবলীগ জামাআতের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে 'নাহি আনিল মুনকার'-এর কাজ যোগ করা হবে কিনা এ নিয়ে শুরুর দিকে আমাদের উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়েছিলো। হযরত থানবী রহ. এর কাছে ফায়সালা চাওয়া হলে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, না, তাবলীগ জামাআতের কাজের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে 'নাহি আনিল মুনকার' যোগ করা যাবে না। করলে এটা সারা বিশ্বে সকলের কাছে পৌছতে পারবে না। তাহলে একই মুরুব্বীর যখন দু'টি কাজ হল তখন মতবিরোধ হওয়ার কোন সুযোগ থাকল না।

খেয়াল করুন! তাবলীগে গিয়ে মানুষের অন্তরে দীনের বুঝ পয়দা হয়। চিল্লা শেষে রুখসতের সময় মারকাযের পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয়, 'ভাই এই অল্প সময়ে আমরা সবকিছু শিখতে পারিনি। কিন্তু এটা বুঝেছি যে, বাড়িতে গিয়ে আমাদেরকে স্থানীয় উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে এভাবে কুরআনে কারীম, নামায, মাসআলা-মাসাইল, জায়েয না-জায়েয, হালাল-হারাম ইত্যাদি অবশ্যই শিখতে হবে।' বলাবাহুল্য এসব শেখা এবং জানার উলামায়ে কেরাম কর্তৃক যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাপনার নামই মজলিসে দাওয়াতুল হক।

আরও বুঝুন, সাইকেল চালাতে দু'টি চাকা লাগে। দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দাওয়াতুল হক দীনের দুই চাকার মত। পরস্পরে কোন সংঘর্ষ নেই। একই ব্যক্তি দাওয়াতুল হক থেকে দীনের সহীহ তা'লীম শিখবে আবার তাবলীগে গিয়ে দশভাইকে শিখিয়ে আসবে এবং নিজের ঈমান ও তাওয়াক্কুল মজবুত করে

আসবে, দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করে আসবে।

যেমনিভাবে আপনারা ঢাকা থেকে পাইকারী দরে মাল কিনে রংপুরে এনে খুচরায় বিক্রি করেন, ঠিক তেমনি দাওয়াতুল হক হল পাইকারী মার্কেট আর তাবলীগ হল খুচরা মার্কেট। এ জন্য দাওয়াতুল হক থেকে সকল আমল সুন্নাত তরীকায় শিখে তাবলীগে গেলে আপনাদের দ্বারা উম্মতের ফায়দা অনেক বেশি হবে।

মাদরাসাগুলোর সমস্যার সমাধান

মাদরাসাগুলো এ কাজকে কাজ বানালে ইনশাআল্লাহ তাদের আর্থিক সঙ্কট ও ছাত্রস্বল্পতার সমস্যা দূর হবে, যে কোন মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ এর বাস্তবতা যাচাই করে দেখতে পারেন। যেসব মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ এ কাজকে গ্রহণ করেছেন তারা অবশ্যই এর ফায়দা প্রত্যক্ষ করছেন।

শেষ কথা হল, এই কাজ না করলে কী হবে? লক্ষ্য করুন!

রাশিয়া ইলমের মারকায ছিল। এ কাজে অলসতা করায় তাদের করুণ পরিণতি!

একটু ভেবে দেখুন, আমাদের মাদরাসাসমূহে হাদীসের যে কিতাবগুলো পড়ানো হয় এগুলো সংকলন করেছেন রাশিয়ার আলেমগণ। রাশিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করেছে হযরত উসমান গনী রাযি.-এর যামানায়। হযরত কুসাম ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত সাঈদ ইবনে উসমান রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম সেখানে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আগমন করেছেন। তৎকালীন সময়ে এই রাশিয়াই ছিল ইসলাম ও ইলমের মারকায। কিন্তু একসময় সেখানে আমভাবে জনগণের উপর মেহনত কমে গেল। উলামায়ে কেরামগণ মাদরাসা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আওয়ামের উপর উল্লেখযোগ্য খেয়াল রাখলেন না। এই সুযোগে লেনিন, কার্লমার্কসরা সেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম করল। সাধারণ জনগণকে উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিল। যে সব মানুষ আগের দিনও উলামায়ে কেরামকে শ্রদ্ধা করত, পরদিন তারাই উলামায়ে কেরামের বুকে বন্দুক চালাল। কম্যুনিস্টরা প্রায় ৫০ হাজার উলামায়ে কেরাম ও দেড় কোটি জমিদারকে শহীদ করে রাশিয়ায় লাল বিপ্লব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। কিছু লোক পালিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসল। লক্ষ্য করুন, একসময় যে ভূ-খণ্ড ছিল ইসলামের মারকায, দীনের ধারক বাহকদের জন্য নিবেদিত প্রাণ, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তা সমাজতন্ত্রের ঘাঁটিতে পরিণত হল।

মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ কোন দিকে এগুচ্ছে!

আজ আমরাও ধীরে ধীরে রাশিয়ার পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষার দায়িত্ব কাদের হাতে দেয়া হয়েছে? বলুন! তারা কি মার্কামারা নাস্তিকের দল নয়? ক'দিন আগে তো তারা বলেই ফেলেছে, 'আমরা এদেশে সেক্যুলার জনগোষ্ঠি তৈরী করতে চাই।' হ্যাঁ একেবারে খোলাখুলি বলে দিয়েছে।

শুনেছি টেলিভিশনে, নাটক-সিনেমায় যত বাটপার আর চোর-ডাকাতের ছবি দেখানো হয়, সব নাকি দেখানো হয় দাড়ি-টুপিওয়ালা হুযূরদের সুরতে। হুযূরের সুরতে রাজাকার বানিয়ে তার উপর জুতা মারা হয়। অথচ ইতিহাস খুঁজে দেখুন, রাজাকারদের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়তো পাঁচ ভাগ ছিল দাড়ি-টুপিধারী গ্রাম্য মাতব্বর, তারা কেউ আলেম ছিল না। আর বাকি ৯৫ ভাগ রাজাকারই ছিল দাড়ি-টুপি বিহীন। তা সত্ত্বেও যত আক্রমণ সব উলামায়ে কেরামের ওপর। আল্লাহর পানাহ! এভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে উলামায়ে কেরামকে চোর-ডাকাত ও রাজাকাররূপে পেশ করা হচ্ছে। যেন মানুষ উলামায়ে কেরামকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাদের কাছে না যায় এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণ না করে। এটা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত এক নীল নকশা। এটা জনগণকে উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র।

গত ১৭ই জানুয়ারি ২০১৬ ইং রবিবার দৈনিক ইনকিলাবের শেষ পাতায় সংবাদ ছেপেছে, এক নাস্তিক মন্ত্রী দেশবাসীকে দাওয়াত দিচ্ছে যে, আমাদের সংবিধানে সমাজতন্ত্র লেখা আছে, এটা সংবিধানের পাতায় থাকলে হবে না; সমাজতন্ত্রকে জীবনের পাতায় আনতে হবে!

এতে কী বোঝা গেল? সমাজতন্ত্রকে জীবনের পাতায় আনার মানে তো সকলের নাস্তিক হয়ে যাওয়া। এদের এ দাওয়াত কী ধর্মপ্রাণ মুসলমান কখনো মেনে নিবে এবং এর দ্বারা কি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে না? জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে না? আল্লাহ না করুন, নাস্তিকদের সিলেবাস ও তাদের দাওয়াত এভাবে চলতে থাকলে আমার আশঙ্কা, তাদের শিক্ষা সিলেবাসের বদৌলতে আগামী দশ বছরে আমাদের সন্তানেরা বর্তমানের চার আনা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বারো আনা নাস্তিকে পরিণত হবে। উলামায়ে কেরামের মেহনত ও তাবলীগের কারণে বাকী চার আনা ঠিক থাকতে পারে। ভেবে দেখুন, দেশের বারো আনা শিক্ষিত লোক যখন নাস্তিক হবে তখন মুসলমানদের সোনার বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের ঘোষণা আসতে আর কোন্ বাধা অবশিষ্ট থাকবে? আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করুন। নাস্তিকদের মেহনত ছাড়াও এদেশে শতাধিক লাইনে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চলছে। সে সব বাতিলের মুখোশ উন্মোচন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভব নয়।

ধ্বংসাত্মক সমস্যার একমাত্র সমাধান!

এজন্য বর্তমানের উলামা ও সুলাহায়ে কেরামকে একযোগে দাওয়াতুল হক ও দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত ও সুন্নাতের তা'লীম নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। ইনশাআল্লাহ, আমরা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিকঠাক মত পালন করলে নাস্তিক ও অন্যান্য বাতিলের দল কোন সুযোগ পাবে না, আল্লাহর রহমতে সব ভেসে যাবে। কারণ দাঈর সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার মদদ থাকে। এটাই কারণ যে, দাঈর সঙ্গে মোকাবেলা করে কেউ টিকতে পারে না, জিততে পারে না। বিজয় শেষ পর্যন্ত দাঈরই হয়! (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৩১১)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে, প্রত্যেকের আওলাদকে দীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন এবং মাদরাসা-মসজিদগুলো সুন্নাতী বানিয়ে এগুলোসহ দীনের সকল মারকাযকে হেফাযত করুন। আমীন ॥

পরিচিতি : শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা। বিশিষ্ট খলিফা, মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

সৎ জীবনে দারিদ্র্য মুমিনের ঐশ্বর্য

মাওলানা মুহাম্মাদ তাফাজ্জুল হুসাইন গাজীপুরী

এক.

রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর সামনে উপস্থিত ফেরেশতাকুলের সরদার হযরত জিবরাঈল আ.। এইমাত্র তিনি প্রিয়তম নবীর কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যুগান্তকারী পয়গাম পেশ করলেন। না, এবার তিনি নবীজীর উম্মতের জন্য পালনীয় কোনো বিধান আনেননি। তাঁর এবারের পয়গামে মক্কার অবাধ্য কুরাইশদের জন্য অনাগত শাস্তির সতর্কবার্তাও নেই। বরং এ সময় রাব্বে কারীমের পক্ষ থেকে তাঁর হাবীবের প্রতি কেবলই সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসা প্রকাশের। এ মুহূর্তটি রাব্বে কায়েনাতের প্রিয়বান্দাকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার সাধ পূরণের। জিবরীলে আমীন আ. কিছুক্ষণ আগে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি অসামান্য প্রতিদানের প্রস্তাব পেশ করে এখন তাঁর সম্মতির অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে উপঢৌকনস্বরূপ মক্কার সমগ্র উপত্যকা স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মক্কা নগরীর সুবিশাল পর্বতমালাকে 'স্বর্ণপাহাড়ে' রূপান্তর করে দিতে চেয়েছেন তিনি। এটা কোনো অলীক কল্পকথা নয়। এ যে মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় গনগনে বাস্তবতা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষকে ভূপৃষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের বানানোর যুগান্তকারী প্রয়াস। কিন্তু জিবরীলে আমীনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র মানবতার চোখের মণি এ মহান মানুষটি যে উত্তর দিলেন তা হীরকখচিত হরফে তুলে রাখার যোগ্য। তিনি অবিচল আস্থার সাথে আরজ করলেন- 'না, আমার রব! আমি বরং একদিন আহার করবো, অপরদিন ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করবো। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট আমি আপনাকে স্মরণ করে কান্নাকাটি করবো। আবার কখনো তৃপ্তিসহ খাবার খেয়ে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হবো, শুকরিয়া জানাবো।' (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩৪৭)

দুই.

মুসলিমজাহানের প্রথম খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর রা.। অর্থাভাবে স্ত্রীর সামান্য মিষ্টান্ন খাওয়ার চাহিদাও পূরণ করতে পারেননি। এ অবস্থায় তাঁর স্ত্রী কিছু পয়সা সঞ্চয় করার জন্য তাঁর অনুমতি নিয়ে নিলেন। এরপর বায়তুলমাল থেকে প্রাপ্ত প্রতিদিনের রেশন থেকে নিজের চেষ্টায় অল্প অল্প বাঁচিয়ে মিষ্টান্নের পয়সা সঞ্চয় করলেন। মিষ্টান্নের জন্য সঞ্চিত এই পয়সাগুলো যখন তিনি স্বীয় স্বামী সিদ্দীকে আকবর রা.-এর হাতে দিলেন তখন সিদ্দীকে আকবর রা. পয়সাগুলোকে 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত' আখ্যা দিয়ে বললেন, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, প্রতিদিনের এই পরিমাণ রেশন আমরা বায়তুলমাল থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করছি। এমনকি স্ত্রীর সঞ্চিত পয়সাগুলো বায়তুলমালে ফেরত দিয়ে প্রতিদিনের রেশন থেকে ঐ পরিমাণ বরাদ্দও কমিয়ে দিলেন।

ইসলামের এই মহান খলীফা তাঁর খিলাফতকালে বায়তুলমাল থেকে যৎসামান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সেগুলোও মুসলমানদের আমানত মনে করে পরবর্তী খলীফার কাছে হস্তান্তর করার ওসিয়ত করে যান।

তিন.

ইসলামপূর্ব যুগে প্রতাপশালী ব্যবসায়ী ছিলেন হযরত আবুদ্দারদা রা.। তাঁর মুসলিমজীবনের ঘটনা। এক কনকনে শীতের রাতে কিছুলোক তাঁর মেহমান হলো। তারা তাঁর ঘরে রাতের খাবার খেলো। কিন্তু তাদের ঘুমাবার জন্য কোনো লেপের ব্যবস্থা না করায় একজন উঠে তাঁর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলো, একসময়ের ধনকুবের আবুদ্দারদা কাত হয়ে শুয়ে আছেন আর তাঁর স্ত্রী পাশে বসে আছেন। তাদের গায়ে পাতলা কাপড় ছাড়া শীত থেকে বাঁচার কোনো অবলম্বনই নেই। লোকটি হযরত আবুদ্দারদা রা.-কে বললো, আপনাদের আসবাবপত্র কোথায়? তিনি উত্তরে বললেন, ঐখানে আমাদের একটি বাড়ি আছে। আমরা এখানে যেসকল আসবাব অর্জন করি তার সবই ওখানে পাঠিয়ে দেই। সেই বাড়িতে পৌছার জন্য আমাদের দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। এ গিরিপথে ভারে ন্যুজ মানুষের চেয়ে স্বল্পভারী মানুষই বেশি সহজে যেতে পারবে। তাই আমরা স্বল্পভারী হতে চাচ্ছি, যেন সহজে এই পথ অতিক্রম করতে পারি। বলাবাহুল্য, হযরত আবুদ্দারদা রা. যে বাড়ির কথা বলেছেন তা দুনিয়াবী কোনো বাড়ি নয়। বরং তিনি পরকালের বাড়ি তথা জান্নাতের কথা বুঝিয়েছেন।

তাঁরা ছিলেন সোনালীযুগের সোনার মানুষ। আমরা তাঁদের আদর্শের অনুসারী, উত্তরসূরী। অর্থাভাবের এই সুমহান আদর্শের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ আমাদের মতো দুর্বল দেহ ও মনের মানুষদের জন্য অসম্ভব ও অসমীচীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধ্যানুযায়ী তাঁদের অনুসরণের সুতীব্র আগ্রহ ও অভিলাষ থাকা ঈমানের অন্যতম দাবী। এতে দ্বীনের অনুসরণ সহজ হয়, আমলের আগ্রহ বজায় থাকে আখেরাত-মুখিতা বৃদ্ধি পায়।

দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মধ্যে পার্থক্য

মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট থাকা, সাদাসিধেভাবে চলা, আড়ম্বরতা পরিহার করা, প্রতিদিন নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল কাজকর্ম করা, নিজেকে কোন বৈধ পেশায় নিয়োজিত রাখা যাতে কোন মতে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় একজন মুমিনের কাছে দুনিয়াবী প্রয়োজনাদির এতটুকুই পূরণ করা কাম্য। আর বাকি সময় আখেরাত আবাদের জন্য আল্লাহর গোলামীতে লেগে থাকা একটি প্রশংসনীয় তরীকা– জীবন পদ্ধতি, যাকে বাহ্যিকভাবে মনে হয় দরিদ্রতা। প্রকৃত অর্থে এটাই হল ধনাঢ্যতা।

কিন্তু এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জিনিস হল বেকারত্ব। শক্তি-সামর্থ্য, সময়-সুযোগ, সুস্থতা থাকার পরও শুধু অলসতা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে বৈধ কাজকর্মে নিজেকে লাগিয়ে না রাখা একটা মারাত্মক ক্ষতিকর স্বভাব। তাছাড়া এটা নাশুকরী; একটি কবীরা গুনাহ। পৃথিবীতে কাজকর্ম করে দুনিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং আখিরাত আবাদ করা আল্লাহ তা'আলার ফরমান ও নবীদের সুন্নাত। এ দুনিয়ায় অকর্মন্য বেকার হয়ে চলার অনুমোদন ইসলামে নেই। নিজের মেধা, যোগ্যতা, শক্তি, সামর্থ্য অনুযায়ী হালাল কাজ করে যেতে হবে, তা যতই ছোট বা নিম্ন শ্রেণীর হোক। হালাল পেশায় কোন লজ্জা নেই। এটাই ইসলামের উদার শিক্ষা। এজন্য

নবীগণ কর্তৃক বকরীর রাখালী করাতে তাঁদের সম্মানহানী হয়নি। বরং তাঁরাই শতভাগ মর্যাদাবান হয়েছেন। হ্যাঁ, কারো সম্পদের কম প্রয়োজন হলে তিনি উপার্জন করে দুর্বল, অসহায়, ইয়াতীম ও ধর্মীয় কাজে দিয়ে দিবেন। এটাই দুনিয়ার নিযাম বা ব্যবস্থা। এটাই সওয়াবের কাজ।

যুদ্ধ দরিদ্রতার বিরুদ্ধে নয়; বেকারত্বের বিরুদ্ধে

কেননা দয়ার নবী রহমাতুল্লিল আলামীন নিজে সর্বদা দরিদ্র থাকতে দু'আ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে নিঃস্বতার জীবন দান করুন এবং নিঃস্ব অবস্থায়ই মৃত্যু দিন। হাশরের ময়দানে আমাকে (দুনিয়াবী) নিঃস্বদের কাতারে শামিল করুন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩৫২)

সুতরাং আমাদের স্লোগান হওয়া উচিত বেকারত্বের বিরুদ্ধে কর্মসংস্থান দিয়ে যুদ্ধ করার, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে ন্যায়-নীতির যুদ্ধের, অশিক্ষা-কুশিক্ষার বিরুদ্ধে সুশিক্ষা দিয়ে লড়াই করার, অশ্লীলতা, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে শালীনতা ও ইনসাফের লড়াইয়ের।

এ জাতীয় বিষয়ে লড়াই করা আল্লাহর নির্দেশ, সমস্ত নবীদের তরীকা, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ এবং উম্মতের যিম্মাদারী। তাই সৎভাবে নীতি-নৈতিকতা সহকারে জীবন যাপন করতে এবং সুন্নাত তরীকায় চলতে অর্থকষ্ট এবং অভাব অনটন হবেই, বিপদের ঘনঘটা আসবেই। তবে এটা অভিশাপ নয়; বরং রহমত। তাইতো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, দরিদ্রতা আমার অভিশাপ নয়, দিয়েছে আমাকে আশির্বাদ। কারণ, একজন মুমিনের জন্য অর্থাভাব জনিত দুশ্চিন্তা এবং দৈন্যদশার উপর সবর করার যে সুবিশাল প্রতিদান ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়ে রেখেছেন তা অর্জন করাই তার জন্য গৌরবের। আর এগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া তার জন্য অভিশাপতুল্য। তাই প্রকৃত মুমিনের জন্য বোঝার বিষয় হল, সৎভাবে জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত। হালালভাবে ইবাদত-বন্দেগী ঠিক রেখে নিয়ন্ত্রিত চাকুরী, ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি কাজকর্ম করে যাওয়া এবং এতে যা হয় তা নিয়ে তুষ্ট থাকা এক বিরাট পূণ্যের কাজ। এ অবস্থায় যদি অনেক বেশি সম্পদের মালিকও কেউ হয়ে যায় তাতে দোষণীয় কিছু নেই। কেননা সৎ ব্যক্তির পবিত্র সম্পদ দ্বারা দুনিয়াতে পাক-পবিত্র, আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতারই লালন হবে। ধর্মের সহায়তা হবে, মজবুতী হবে।

দরিদ্রতার মাহাত্ম্য ও ধনাঢ্যতার আশঙ্কা

ফকীর বা দরিদ্র ঐ ব্যক্তিকে বলে যার নিকট সামান্য সম্পদ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তা নেসাবের পরিমাণ অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেয়ে কম হয়। ফকীরের কাছাকাছি আরেকটি শব্দ মিসকীন। মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার নিকট সম্পদ বলতে কিছুই থাকে না।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী সম্পদশালী ব্যক্তি উত্তম, না ধৈর্য্যধারণকারী দরিদ্র ব্যক্তি উত্তম? এ ব্যাপারে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুলাহ্হাব রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ধনী ব্যক্তিই উত্তম। কেননা তিনি দরিদ্রদের ন্যায় অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী পালন করার পাশাপাশি মালী ইবাদতও অধিক পরিমাণে আদায় করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এবং সূফী-সাধক ইমামগণের মতে অল্পে তুষ্ট ধৈর্য্যধারণকারী দরিদ্র ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট উত্তম। কারণ সংখ্যায় অতি নগণ্য কয়েকজন নবী ব্যতীত সমস্ত নবী, আউলিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ফকীর বা দরিদ্র ছিলেন।

এছাড়াও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এভাবে দু'আ করতেন– হে আল্লাহ! আমাকে নিঃস্বতার জীবন দান করুন এবং নিঃস্ব অবস্থায়ই মৃত্যু দিন। হাশরের ময়দানে আমাকে (দুনিয়াবী) নিঃস্বদের কাতারে শামিল করুন। (একথা শুনে) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বললেন, এমনটি কেন চাচ্ছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, কেননা তারা ধনীদের থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোন মিসকীনকে তোমার দুয়ার হতে (রিক্তহস্তে) ফিরিয়ে দিয়ো না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান কর। হে আয়েশা! মিসকীনদেরকে ভালোবাসবে এবং তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর নিকটে স্থান দিবেন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩৫২)

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষার বস্তু। (সূরা তাগাবুন- ১৫)

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, নিশ্চয় আমি সুফ্‌ফাবাসীদের মধ্য হতে সত্তর জন লোককে দেখেছি, তাদের কারো নিকট একখানা চাদর ছিল না। হয়তা একখানা লুঙ্গি ছিল; অথবা একখানা কম্বল– যা তারা নিজেদের ঘাড়ের সাথে পেঁচিয়ে রাখত। তা কারো অর্ধ গোড়ালী পর্যন্ত, আবার কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছত। আর তারা তাকে হাত দ্বারা ধরে রাখত এ আশঙ্কায়, যেন সতর প্রকাশ না হয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৪২)

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে, আল্লাহ তা'আলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হবেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৫৪)

হযরত আমর ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার ভয় করি না; বরং আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হবে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমরা তা অর্জনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, যেভাবে তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। এবং দুনিয়াবী সম্পদই তোমাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করে দিবে যেভাবে তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করেছিল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪০১৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৯৬১)

হযরত কা'ব ইবনে ইয়ায রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য একেকটি ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) রয়েছে। আর আমার উম্মতের জন্য ফিতনা হল ধন সম্পদ। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩৩৬)

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মি'রাজের রাতে বা স্বপ্নযোগে) আমি একবার জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। তখন দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর এটাও দেখলাম, সম্পদশালী লোকেরা আটকা পড়ে

আছে। কিন্তু কাফের জাহান্নামীদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ালাম। তখন দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই নারী সম্প্রদায়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৫৪৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৭৩৬)

বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. বলেন, দরিদ্রতা এত বড় একটি নিয়ামত যার উপর হাজার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। (আনওয়ারুল মিশকাত ৬/৩৬৪)

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও বুযুর্গানে দীনের বক্তব্য দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট নেককার ধৈর্য্যশীল গরীবের মর্যাদা নেককার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ধনীর চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, এ জাতীয় আরো শত শত হাদীস রয়েছে। উক্ত আলোচনায় একথাও বোঝা গেল যে, নেককার ধৈর্য্যশীল দরিদ্র ব্যক্তি তার ইবাদতের দ্বারা যে মর্তবায় পৌঁছতে পারে, নেককার কৃতজ্ঞ ধনী ব্যক্তি মাল দ্বারা সে স্তরে পৌঁছতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ধনবানদের হতাশার কিছু নেই। তারাও ধন সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে অফুরান ফযীলত ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন। দানশীলতা ও উদারতায় হতে পারেন হযরত উসমান গনী রাযি. এর যোগ্য উত্তরসূরী এ প্রসঙ্গে জনৈক বুযুর্গের উক্তি মনে রেখাপাত করার মতো। তিনি বলেছেন যে, দুনিয়ার সম্পদের দৃষ্টান্ত হল বিষধর সাপের ন্যায়। যে ব্যক্তি সাপের মন্ত্র জানে সাপ তাকে দংশন করে না। বরং তার গলায়ও বসে থাকে। আর যে ব্যক্তি সাপের মন্ত্র জানে না, তাকে সাপ দংশন করে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরীকায় মেহনত করে সাহাবাদের মত দুনিয়া চালানোর মন্ত্র শিখেছে তাকে দুনিয়ার দৌলত কোন দিন গোমরাহ করবে না। বরং তার গলায় কিংবা হাতে থেকে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তির পথ সহজ করে দিবে। আর যে ব্যক্তি উক্ত তরীকায় দুনিয়া চালানোর মন্ত্র শিখবে না তাকে এ দুনিয়ার সম্পদ দংশন করে দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দিবে।

ইসলাম সৎ, ধর্মময় ও সাধনার জীবনে উৎসাহ দেয়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী সাম্যনীতিতে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, মালিক-শ্রমিক, মহাজন, দারোয়ান সকলেরই সমাজে সমানভাবে সুখ-দুঃখ ভোগ করার অধিকার আছে। একজন সুখী হলে অপরজনকেও তার সুখের অংশীদার বানাবে। দুঃখী হলে অপরজনও তার পাশে দাঁড়াবে। এটাই হল মানবতা, মনুষত্ব, বিবেক, ইনসাফ ও ধর্মের আদর্শ।

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে কর্মঠ, উজ্জীবিত, সাহসী, কর্মজীবী হওয়ার প্রেরণা যোগায়। এ মর্মে কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : যখন নামায শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা রিযিকের তালাশে যমীনে ছড়িয়ে যাও। (সূরা জুমু'আ- ১০)

হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, হালাল রিযিক উপার্জন করা অন্যান্য ফরযের পর ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয বিধান। (মিশকাত; পৃষ্ঠা ২৪২, বাইহাকী)

হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দীকারাব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি নিজের হাত দ্বারা উপার্জিত খাবার থেকে উত্তম কোন খাবার খেতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২০৭২)

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সমস্যা-মুসীবত থেকে বাঁচার জন্য, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করার জন্য ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য হালালভাবে দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করবে সে কিয়ামতের দিন পূর্ণিমা রাতের চাঁদের চেহারা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। আর যে ব্যক্তি অধিক সম্পদশালী হওয়ার গর্ব অর্জন করার জন্য এবং মানুষের মাঝে ধনাঢ্যতার প্রদর্শনীর ইচ্ছায় বৈধভাবেও দুনিয়ার সম্পদ কামাই করবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে তিনি ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় থাকবেন। (শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৯৮৯০)

সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা ইসলামের নির্দেশ পরিষ্কার যে, নিজে বৈধভাবে উপার্জন করা, অন্যকে সহযোগিতা করা, হালাল উপার্জনে লেগে থাকা এসবই ফরয, যদি ঈমান-আমল দুরস্ত থাকে। অতএব শুধু তাওয়াক্কুলের নামে কাজকর্ম ছেড়ে বসে থাকা গোমরাহী এবং পরিবারে বদগুমানী সৃষ্টির কারণ।

ভিক্ষাবৃত্তি ও মানুষের নিকট হাতপাতা নিষেধ

সমস্ত নবী, সাহাবায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দীনের সুন্নাত হল, ইচ্ছাকৃতভাবে অল্পে তুষ্ট থেকে দরিদ্রতা অবলম্বন করা। কিন্তু তাঁদের কারো জীবনেই মানুষের নিকট চাওয়ার মানসিকতা ছিল না। এ কাজকে তাঁরা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তবে দীনী প্রয়োজনে অন্যের জন্য দান-সদকায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। সেটা চাওয়ার আওতায় পড়ে না। তাই সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়ও বটে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তির অনুমতি দেয়নি। এজন্যই দয়ার নবী তাঁর দরবারে উপস্থিত ভিক্ষুককে তার কম্বল বিক্রি করা টাকায় কুঠার কিনে কাঠ কেটে কর্মময় জীবন যাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। অতঃপর সে এক সময় স্বাবলম্বী হয়ে গেল।

হযরত কুবাইসা ইবনে মুখারিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে কুবাইসা! তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন লোকের পক্ষে চাওয়া হালাল নয়। (এক) ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের ঋণ পরিশোধের যিম্মাদার হয়েছে তার জন্য চাওয়া হালাল, যতক্ষণ না সে ঋণ পরিশোধ করে। আর সে নিজেকে তা হতে বিরত রাখবে। (দুই) আরেকজন এমন ব্যক্তি যার উপর এমন বিপদ পৌঁছেছে যা তার সম্পদকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তার জন্য চাওয়া হালাল, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণ করার মত কিছু অর্জন না করে। (তিন) আরেকজন ঐ ব্যক্তি, যে এতো বেশি অভাবে পতিত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন প্রতিবেশী সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যিই সে অভাবে পড়েছে। তার জন্য চাওয়া হালাল, যতক্ষণ না সে তার জীবিকা নির্বাহের মত কিছু অর্জন করে। এ তিন অবস্থা ব্যতীত অন্য সকল অবস্থায়ই চাওয়া হারাম। হে কুবাইসা! (এই তিন অবস্থা ব্যতীত) ভিক্ষুকের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির উপার্জন ভক্ষণ করা হারাম। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৪৪)

হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে যামিন হতে পারে যে,

মানুষের কাছে সে কিছু প্রার্থনা করবে না আমি (মুহাম্মাদ) তার জন্য জান্নাতে পৌঁছে দেয়ার যামিন হতে পারি। তখন হযরত সাওবান রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সাওবান রাযি. এরপর আমৃত্যু কারো নিকট কিছু চাননি। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৬৪৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে চাইতে থাকবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখে সামান্য গোশতের প্রলেপও থাকবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৪৭৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৪০)

তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে দেখা যায় যে, তাঁরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধন-সম্পদ বৈধভাবে আসলেও তা গ্রহণ করতেন না। বরং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। কারণ তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন যেভাবে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে পানি থেকে বাঁচানো হয়। এজন্যই দেখা যায় হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাযি. নিজে স্বর্ণ-রৌপ্যকে লক্ষ্য করে বলতেন, হে স্বর্ণ-রৌপ্য! আমি ব্যতীত অন্য কাউকে ধোঁকা দাও।

এক সাহাবী একবার বাড়ির পার্শ্বের বাগানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। সেখানে একটি ইঁদুর গর্ত থেকে পর্যায়ক্রমে মুখে করে একেকটি দীনার নিয়ে এসে জমা করছিল এটা দেখে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে আসলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো গ্রহণ করা আমার জন্য বৈধ হবে কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তুমি যে আল্লাহর কাছে রিযিকের দু'আ করে দীনের কাজে লেগে গিয়েছ, এজন্য আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে ইঁদুরের মাধ্যমে তোমার রিযিক পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন (সুবহানাল্লাহ)। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩০৮৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২৫০৮, খুতুবাতে যুলফিকার; পৃষ্ঠা ২৯)

ইমাম গাযালী রহ. এর জীবনে দরিদ্রতা

পৃথিবীর ইতিহাসে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, মহামনিষী, পণ্ডিত, বিদ্বান, আল্লাহওয়ালা, বুযুর্গ, দুনিয়া-আখিরাতের পথপ্রদর্শক বহু সূফী-সাধক এবং দুনিয়ার লাইনের বহু গুনীজন এমন অতিক্রান্ত হয়েছেন যাদের স্বর্ণগাঁথা ত্যাগ-তিতিক্ষার জীবনী পাঠে মনে হয়, এ ধরাপৃষ্ঠে তাদের আগমনে দুনিয়াবাসী ধন্য হয়েছেন। আর তাদের জীবনের দরিদ্রতা তাদের জন্য রহমত হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম গাযালী রহ.। এই নশ্বর দুনিয়ার এমন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি নেই যিনি তার নাম জানেন না। অথচ তার জীবনের সূচনা অত্যন্ত বেদনাবিধুর, হৃদয়গ্রাহী।

ইমাম গাযালী রহ. ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের খোরাসান প্রদেশে অবস্থিত তাহেরান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মাদ। তিনি কোন কারণে অনুতাপ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার ছেলে দু'টি যেন তার মত অশিক্ষিত না হয়। বরং বিদ্বান হয়। ইমাম গাযালী রহ. এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। তার ছোট ভাইয়ের নাম আহমাদ। কিন্তু পিতার সেই স্বপ্ন পিতার জীবদ্দশায় পূরণ হল না। ইমাম গাযালী রহ. এবং তার ভাই আহমাদ যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক; এখনো শিক্ষার বয়স হয়নি, তখন তার পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। নিশ্চিত মৃত্যু সন্নিকটে বুঝতে পেরে তার এক সূফী বন্ধুকে ডেকে এনে পুত্রদ্বয়কে তার হাতে তুলে দিয়ে অসীয়ত করলেন, হে প্রিয় ভাই! আমি নিজে লেখাপড়া কিছুই শিখতে পারিনি। তবে মনে আশা ছিল আমার ছেলে দু'টিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মনের মত মানুষ করে তুলব। কিন্তু আমি যে রোগে আক্রান্ত হয়েছি, মনে হচ্ছে আর কোন দিন সুস্থতা লাভ করতে পারব না। তাই তোমার নিকট আমার অনুরোধ, বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে তুমি আমার এ সন্তান দু'টির শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

পিতার মৃত্যুর পর তারা দু'ভাই উক্ত সূফী সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর পিতার বন্ধু বললেন, তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তোমাদের পিতা আমার নিকট যে অর্থ-কড়ি রেখে গিয়েছিলেন তা শেষ হয়ে গেছে। আর বর্তমানে আমার নিজের আর্থিক অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয় যে, আমি তোমাদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার গ্রহণ করব। সুতরাং আমার মতে তোমরা দু'ভাই এমন কোন মাদরাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া কর, যেখানে গরীব ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ানো হয়। এমতাবস্থায় ইমাম গাযালী রহ. তার পরামর্শ অনুযায়ী এ ধরনের মাদরাসার তালাশে বের হয়ে পড়লেন।

সে যুগে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে প্রায় সবদেশে এমন প্রচলন ছিল যে, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ, জ্ঞানের নক্ষত্র বিশিষ্ট আলেমগণ নিজ নিজ গৃহে অথবা মসজিদে মসজিদে ছাত্রদেরকে তা'লীম-তরবিয়ত বা শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। আর এ সকল মুসাফির ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ স্থানীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ আঞ্জাম দিতেন। যার ফলে দেশ-বিদেশের ধনী-গরীব যে কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেত। ইমাম গাযালী রহ.-ও এমন একটি সুযোগ পেলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ফিকহ শাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবসমূহ তাদের শহরের বিখ্যাত আলেম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ রাযকানী রহ. এর নিকট সমাপ্ত করলেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার আশায় জুরজান শহরে চলে গেলেন। সেখানে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম আবূ নসর ইসমাঈলী রহ. এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আরো উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন দুনিয়ার জ্ঞানের শহর বাগদাদ ও নীশাপুরে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে জগদ্বিখ্যাত আলেম ইমামমুল হারামাইন যিয়াউদ্দীন আব্দুল মালেকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শিক্ষার কাজ শুরু করে দিলেন।

তৎকালীন সময়ে মুসলিম বিশ্বে ইমামুল হারামাইনের চেয়ে বড় আলেম আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। যার ফলে তার সাহচর্যে ইমাম গাযালীও এক সময় গভীর পাণ্ডিত্যে দেশব্যাপী সুনাম অর্জন করে নিলেন। এক সময় তার উস্তাদ ইমামুল হারামাইন মাদরাসায়ে নিযামিয়া– যা মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী বিদ্যাপীঠ ছিল– সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্তীতে ৪৭৮ হিজরীতে তার উস্তাদের ইন্তিকালের পর বিজ্ঞ মহল ইমাম গাযালীর গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত করেন। এভাবেই ইমাম গাযালী মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, পণ্ডিত, দার্শনিক ও সূফী-সাধকে পরিণত হন। বলাবাহুল্য, এমন সমুচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে তিনি আর্থিক দৈন্যদশাকে বাধা হিসেবে সাব্যস্ত না করে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন।

(৩৯ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

দীনী প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাসমাপনকারী ফুযালায়ে কেরামের যিম্মাদারী

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা.

হামদ ও সালাতের পর...
হাযারাতে উলামায়ে কেরাম ও প্রিয় তালিবানে ইলম!
ঘোষক মাওলানা ছাহেব বয়ানের জন্য আমার নাম ঘোষণা করেছেন, কিন্তু আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে দেননি। এজন্য আমার মনে উপস্থিত যে বিষয়টি উদিত হয়েছে, তারই ওপর কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এখন আমি 'ফুযালায়ে কেরামের যিম্মাদারী' শিরোনামে আলোচনা করার ইচ্ছা করছি।
আপনাদের সামনে কুরআনে কারীমের সূরা তাওবার একটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً...

অর্থ: মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে জিহাদে রওয়ানা হয়ে যাবে।
এই সূরা তাওবারই অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا.

অর্থ: তোমরা জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়, সাজ-সরঞ্জাম অল্প হোক কিংবা ভারি হোক।
অর্থাৎ সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা না হলেও বেরিয়ে পড়, প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা হলেও বেরিয়ে পড়। জ্বী, জিহাদ হল দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা এর জন্য انْفِرُوا (গণহারে বেরিয়ে পড়া) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার আমাদের আলোচ্য আয়াতেও একই শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً.

অর্থ : মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়, সকলের একসঙ্গে জিহাদে বেরিয়ে পড়া। কেননা যদি সকলেই একসঙ্গে জিহাদে বেরিয়ে পড়ে তাহলে ক্ষেত-খামার কে সামলাবে? নারী-শিশুদের দেখভাল কে করবে? রাষ্ট্র পরিচালনা কে করবে? মামলা-মোকাদ্দমা কে দেখবে? সকলেই যদি একসঙ্গে জিহাদে চলে যায় তাহলে এসব কাজ দেখাশোনার কেউ থাকবে না। অথচ এগুলোও অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট

পুরো সূরা তাওবাটি তাবুক যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আপনাদের জানা আছে, ইসলামের ইতিহাসে তাবুক যুদ্ধ অনেক কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযান। এ যুদ্ধে মুসলমানদের তৎকালীন সুপার পাওয়ার রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে টক্কর লেগেছিল। আল্লাহরই ইচ্ছা, শত্রু মোকাবেলায় আসেনি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ হাজার জানবায মুজাহিদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাবুক পর্যন্ত মার্চ করলেন। তাবুক ছিল জাযিরাতুল আরবের সীমান্ত এলাকা। এর ওপাশেই রোমান সীমান্ত। নবীজী নিজেদের সীমানায়, জাযিরাতুল আরবের সীমানায় থেমে গেলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলেন না। তিনি যদি রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতেন এটা পলিটিক্যাল ফল্ট হয়ে যেতো, রাজনৈতিক ভুল হিসেবে বিবেচিত হতো। রোমানরাও তাদের সীমান্ত অতিক্রম করে বাহাদুরি দেখাতে আসল না। ভয়ে? না, ভয়ে নয়, এটা ছিল একটা রাজনৈতিক চাল। ইতিহাস পর্যবেক্ষণে অনুধাবন করা যায়, রোমানদের এগিয়ে না আসা ছিল একটা কূটচাল যে, মুসলিমরা আমাদের সীমান্তে প্রবেশ করুক তারপর দেবো একসঙ্গে ছাতু বানিয়ে। নবীজী তাদের চালবাজি ধরে ফেলেছিলেন তাই নিজেদের ভূখণ্ডেই অবস্থান নিলেন। কয়েক দিন পর্যন্ত শত্রুর অপেক্ষায় রইলেন। অতঃপর যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন যে, ওরা আর আসবে না তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ের পতাকা ওড়াতে ওড়াতে মদীনার পানে রওয়ানা হলেন।
কাফেলার দূরদৃষ্টিসম্পন্নরা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, রোমানদের এগিয়ে না আসা আসলে একটি রাজনৈতিক চাল, নবীজী যেটাকে অত্যন্ত সফলভাবে বানচাল করে দিয়েছেন। তবে কাফেলার সাধারণ ব্যক্তিবর্গ এ সুধারণার শিকার হয়েছিলেন যে, আমাদের শক্তি এখন এ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, সুপার পাওয়ারও চোখ তুলে তাকানোর হিম্মত রাখে না। এজন্য মদীনায় পৌঁছার পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন,

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر.

অর্থাৎ এটাই তাদের সঙ্গে আমাদের শেষ লড়াই নয়, এটা তো একটা ছোট যুদ্ধ। আগামীতে তাদের সঙ্গে বড় বড় যুদ্ধ হবে। এখন ফিরে গিয়ে সেই বড় বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। হযরত ফারূকে আযম রাযি.-এর খেলাফতকালে রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ 'ইয়ারমুকের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিল। ইয়ারমুকের লড়াইয়ের পর রোমানদের শক্তি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এটা এমন কঠিন যুদ্ধ ছিল যে, হযরত ফারূকে আযম রা. সে সময় একটা দিনও মদীনায় স্বস্তিতে ঘুমাতে পারেননি। যুদ্ধের সংবাদ জানার জন্য প্রতিদিন ফজরের পর সিরিয়া যাওয়ার পথে দূতের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতেন , না জানি কী সংবাদ নিয়ে আসে? তো এদিকে ইঙ্গিত করেই নবীজী তাবুক থেকে ফেরার পথে এই মন্তব্য করেছিলেন,

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر.

আমরা ছোট অভিযান শেষ করে এখন বড় অভিযানের দিকে পা বাড়ালাম। কাজেই ফিরে গিয়ে 'খরগোশী-নিদ্রা'য় লিপ্ত হওয়া যাবে না। বরং লাগাতার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কেননা ভবিষ্যতে ওদের সঙ্গে বড় বড় লড়াইয়ে নামতে হবে। যাহোক, মুসলিম বাহিনী বিজয়ীবেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করল। এবার যে সব মুনাফিক বিভিন্ন বাহানায় কিংবা বিনা বাহানায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে নানারকম ওযর-আপত্তি পেশ করতে লাগল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রী অসুস্থ ছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাল-বাচ্চার অসুখ করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট অসুস্থ ছিল, মুরগি অসুস্থ ছিল...। দরিয়া-দিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজর কবুল করে তাদেরকে মাফ করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবা অবতীর্ণ করে মুনাফিকদের সকল বাহানার মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন

এবং মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের চক্রান্ত ও ফেরেববাজির পর্দা ফেঁড়ে দিলেন। এবার পরিস্থিতি এই দাঁড়াল যে, ছোট ছোট অভিযানের জন্য নাম লিখাতে বলা হলে সকলেই তৈয়ার। সাহাবায়ে কেরাম তো এমনিতেই তৈয়ার আর মুনাফিকরা ভয়ে, না জানি আবার কোন সূরা নাযিল হয়ে সবকিছু ফাঁস করে দেয়া হয়! তো কোন কাজে লোক প্রয়োজন চার/পাঁচশত আর প্রস্তুত দশ হাজার। এখন কী করা হবে?

এই প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হল,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً.

মুসলমানদের হালত ও অবস্থা অনুমতি দেয় না যে, সবাই একই সঙ্গে জিহাদে বেরিয়ে পড়বে। সবাই যদি একই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে তাহলে দীনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কে আঞ্জাম দিবে? এখন প্রশ্ন হল তাহলে জিহাদের জন্য কী পরিমাণ লোককে বেরোতে হবে? আল্লাহ তা'আলাই বলে দিচ্ছেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين.

এমন কেন করছো না যে, প্রত্যেক বড় গোত্র থেকে কিছু লোক বাছাই করা হবে। উদাহরণত প্রয়োজন অনুপাতে পাঁচশত লোক জড়ো করা হবে। তবে এই পাঁচশতের মধ্যে প্রতিটি গোত্রের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ প্রত্যেক গোত্র থেকেই লোক নিতে হবে। এর রহস্য হল, যখন এই জিহাদী কাফেলা রওয়ানা হবে, আর তাদের সঙ্গে নবীজীও থাকবেন তখন এই কাফেলা 'দারুল উলূম', 'মুঈনে দারুল উলূম'-এ পরিণত হবে, 'মোবাইল দারুল উলূম'-এ পরিণত হবে। এই কাফেলা দীন শিখতে শিখতে যাবে, আসতে আসতেও শিখতে শিখতে আসবে। এতে জিহাদের উদ্দেশ্যও পুরা হবে, শেখা-শেখানোর উদ্দেশ্যও পুরা হবে। তো প্রত্যেক কবীলা ও গোত্র হতে লোক বাছাই করার উদ্দেশ্য হল, তারা যেন এই সফরে لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين দীনের গভীর বুঝ-বুদ্ধি অর্জন করে। অতঃপর পাঁচশত ব্যক্তি যারা নবীজীর নিকট থেকে ইলম অর্জন করে এসেছে তাদের মাধ্যমে প্রতিটি গোত্রে ইলম পৌঁছে যাবে। কেননা কাফেলায় প্রতিটি গোত্রেরই প্রতিনিধিত্ব ছিল। উদাহরণত কোন গোত্রের পাঁচ ব্যক্তি কাফেলায় শরীক ছিল। তো এই পাঁচ ব্যক্তির মাধ্যমে পুরো গোত্রে ইলম পৌঁছে যাবে। وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ এরা এসে নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে, ওয়ার্নিং দিবে। তাদেরকে সতর্ক করবে, চৌকান্না করবে। কেন? لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ যেন তারা পরহেয করে চলে, শরীয়তের খেলাফ কাজ না করে। এই হল আলোচ্য আয়াতে কারীমার তরজমা।

উলামায়ে কেরামের জন্য দু'টি বিষয়

এ আয়াতে কারীমায় উলামায়ে কেরামের জন্য দুটি বিষয় রয়েছে। আর জাতির জন্য আছে একটি বিষয়।

উলামায়ে কেরাম সম্পর্কিত প্রথম বিষয়টি হল, ইলমে দীন অর্জনের চূড়ান্ত পর্যায় হল, দীনের তাফাক্কুহ হাসিল করা, দীনের পরিপূর্ণ বুঝ অর্জন করা। যতদিন পর্যন্ত দীনের পরিপূর্ণ বুঝ হাসিল না হবে ততদিন পর্যন্ত ইলমী সফর অব্যাহত থাকবে। দেখুন, মওলবী হওয়া, হুযুর সাহেব হওয়া ইলমে দীনের শেষ প্রান্ত নয়। ইলমে দীনের শেষ প্রান্ত হল তাফাক্কুহ হাসিল করা। গভীরে পৌঁছে দীনের পুরা সমঝ হাসিল করা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

শব্দে বধ আজকের ফুযালায়ে কেরাম

আজ আমাদের মাদরাসাগুলো থেকে শিক্ষাসমাপনকারী ফুযালায়ে কেরামকে দুটো শব্দ সর্বনাশ করে ছেড়েছে। জ্বী, শব্দেরও আশ্চর্য শক্তি আছে। একটি শব্দ হল, আমি 'ফারেগ' হয়ে গেছি। আরে ভাই, মানুষ ফারেগ তো হয় বাইতুল খালা হতে, টয়লেট থেকে। মাফ করবেন, আপনার মাদরাসা কি তাহলে আপনার বাইতুল খালা মানে টয়লেট!? যা থেকে আপনি নিষ্কৃতি লাভ করেছেন? তা কি করে হয়!

দ্বিতীয় শব্দটি হল, ফাযেল। আর 'ফাযেল' শব্দটির উৎপত্তি তো হল 'ফুযুল' থেকে। এখনও বন্দুক ধরতে শেখেনি নাম তার লাট-বাহদুর। দু'লাইনও ভালো করে পড়তে পারে না, উপাধি লাগায় আল্লামাতুদ-দাহর। আসলে যে কথাটি আপনাদের কাছে আরয করতে চাচ্ছি তা হল, আমাদের আরবী মাদরাসাগুলো থেকে কাউকে ইলম বিতরণ করা হয় না। এখান থেকে শুধু ইলম অর্জনের ইস্তিদাদ বা যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। কাজেই মাদরাসা থেকে বের হওয়ার পর মেধাবী ছাত্র হলে কমপক্ষে দশ বছর, মাঝারি মেধার হলে পনেরো বছর, আর দুর্বল মেধার হলে বিশ বছর ধরে যদি দিন-রাত কিতাবের পোকা হয়ে থাকতে পারেন তাহলে এত বছর পর ইলম আসতে শুরু করবে। আর যখন ইলমের আগমন শুরু হবে, তখন আপনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন, এখন কিছু কিছু আসছে। হ্যাঁ, রাতদিন কিতাবের পোকা হয়ে দীর্ঘ মেহনতের পর অনুভূত হবে, এতদিন আসলে ঢোল ছিলাম, যার থেকে অযথাই শব্দ নির্গত হতো। তারপর একসময় বুঝে আসবে, ঢোলের মধ্যে কিছু কিছু জমা হচ্ছে। ভাইয়েরা! ইলম হল কূল-কিনারাহীন অতল সমুদ্র। ইলমের কোন কিনারা নাই, কিনারার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং কেউ যদি মনে করে, আমি জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে পৌঁছে যাবো, তার সীমান্ত দেখে নেবো, মঞ্জিল ঠিক করে নেবো–এটা অসম্ভব। কারণ এই দরিয়ার তো কিনারাই নাই। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা কিতাবের এক জায়গায় লিখেছেন, ইলম অর্জনের ধারাবাহিকতা শুধু দুনিয়ার জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নয়। কবরের জীবনেও অবিরাম ইলম অর্জিত হতে থাকবে। অতঃপর কিয়ামত দিবসে, পঞ্চাশ হাজার বছর সমপরিমাণ দিনে ইলম হাসিল হতে থাকবে। তারপর জান্নাতের অনন্তকালীন জীবনেও ইলম অর্জনের ধারাবাহিকতা সচল থাকবে। বলছিলাম, ইলম এমন এক সমুদ্র যার কূল-কিনারা নাই। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর ইলমের তুলনায় সকল মাখলুকের সম্মিলিত ইলম, কোন পাখির এক/দু'বার সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ঠোঁটে তোলা সামান্য পানির মতো, বরং তারচেয়েও কম।

পূর্ণতার দুই স্তর

ভাইয়েরা! একটি বিষয় ভাল করে বুঝুন। কামালাত বা পূর্ণতা দু' ধরণের। এক. প্রথম স্তরের পূর্ণতা। দুই. দ্বিতীয় স্তরের পূর্ণতা। প্রথম স্তরের পূর্ণতা আল্লাহ তা'আলার দান, তার বিশেষ অনুগ্রহ। এতে মানুষের হাত নেই, অর্জন করার কষ্ট নেই। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের পূর্ণতা অর্জন করতে মেহনত করতে হয়। মেহনত ছাড়া তা অর্জিত হয় না। উদাহরণ নিন।

দৃষ্টান্ত-১ : আমরা মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছি। পৃথিবীতে যত মাখলুক আছে সব মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। মাটির কোন অংশকে আল্লাহ তা'আলা মহিষের আকৃতি দিয়েছেন, কোনটাকে ঘোড়া বানিয়েছেন, কাউকে কুকুর-শুকর বানিয়েছেন। আবার কোন অংশকে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ বানিয়েছেন। এটা প্রথম স্তরের পূর্ণতা; আল্লাহর দান, কারও নিজস্ব যোগ্যতা এখানে কার্যকর নয়। এখন মানুষ হওয়ার পর দ্বিতীয় স্তরের পূর্ণতা আমাদের সামনে– জান্নাতে প্রবেশ

করতে হবে। এর জন্য অর্জন ও মেহনত জরুরী। যদি আমরা তা না করি তাহলে আমাদের ঠিকানা হবে ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ জাহান্নামের অতল গহ্বরে। আর যদি জান্নাতের সামানা সংগ্রহ শুরু করে দেই তাহলে একপর্যায়ে إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا সর্বোচ্চ জান্নাত ফিরদাউসে পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ।

দৃষ্টান্ত-২ : আরেকটি উদাহরণ নিন। প্রতিটি মানুষের কিছু ইলম ন্যাচারাল তথা স্বভাবজাত। শিশুরা শৈশবের জ্ঞান ন্যাচারালি শিখে যায়। যুবক তার যৌবনের ধর্ম ন্যাচারালি শিখে। অনুরূপ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নিজ নিজ জ্ঞান প্রকৃতিগতভাবেই শিখে নেয়। এগুলো প্রাকৃতিক জ্ঞান। মৌলবী হওয়া স্বভাবজাত পূর্ণতা নয়, এর জন্য তো কিছু করতে হয়। আলেম হতে হলে কিছু করতে হয়, ফকীহ হতে হলে কিছু কুরবানী পেশ করতে হয়। এগুলো ন্যাচারালি অর্জিত হয় না।

দৃষ্টান্ত-৩ : আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় দুনিয়াতে আগমন করলেন, জাজিরাতুল আরবের উম্মী লোকেরা তাদের গোমরাহী থেকে বের হয়ে হেদায়াতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের কোন ইচ্ছা করেছিল কি? না, এ ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহই ছিল না। কেবল আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়ায় আরবের উম্মী লোকেরা মুসলমান হয়ে গেল। এটা প্রথম স্তরের কামাল। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামের যে কল্পনাতীত মর্যাদা সেটা তাদের অর্জিত। সাহাবায়ে কেরাম দীনের জন্য বহু কাজ করেছিলেন তারই ফলশ্রুতিতে এই সুমহান মর্যাদা তাদের লাভ হয়েছে। আজ আমরা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা পাব না। কারণ আমরা সাহাবাওয়ালা কাজ করছি না। কুরআনে কারীমে একটি আয়াত আছে, সাধারণত এটাকে সঠিকভাবে বোঝা হয় না। كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (অর্থ : তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে, তোমরা (মানবজাতিকে) সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজ হতে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।) হযরত ফারূকে আযম রা. বলেন, আয়াতে বর্ণিত শ্রেষ্ঠত্ব গোটা উম্মতে মুসলিমার জন্য প্রযোজ্য নয়, শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। خاصة في اصحاب محمد... জ্বী, শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জন্য। তিনি আরও বলেছেন, ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত উম্মত আসবে তাদের মধ্যে যারা সাহাবাওয়ালা আমল করবে, সাহাবায়ে কেরামের পাশাপাশি কেবল তারাই এ আয়াতের প্রয়োগস্থল বিবেচিত হবে। এটা হযরত উমর রা.এর বক্তব্য। প্রমাণের প্রয়োজন হলে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. লিখিত হায়াতুস সাহাবা কিতাবের 'আল আসার ফী সিফাতিস সাহাবাতিল কিরাম' শিরোনামের প্রথম বর্ণনাটি দেখে নিবেন।

খায়রে উম্মত কারা?

তাছাড়া এটা স্বতঃসিদ্ধ কথাও বটে। নইলে এই যে শিয়া সম্প্রদায় এরাও কি খায়রে উম্মত, শ্রেষ্ঠ উম্মত? এই যে বেশুমার গোমরাহ ফেরকা এরা সবাই খায়রে উম্মত, শ্রেষ্ঠ উম্মত? এরাও যদি খায়রে উম্মত হয় তাহলে তো অবস্থা আজব দেশের গজব রাজার মত হয়ে গেল, যেখানে 'এক টাকা সের ভাজা, এক টাকা সের খাজা' অর্থাৎ তেল-ঘি এক সমান। আল্লাহর কুরআন কি গল্পের আজব দেশ?

এই সব গোমরাহ ফেরকাও যদি খায়রে উম্মতের হিস্যাদার হয় তাহলে তো আল্লাহর ব্যবস্থাপনা সেই 'টাকায় সের ভাজা, টাকায় সের খাজা'র মতো হয়ে গেল। না ভাই, আল্লাহর ব্যবস্থাপনা এমন নয়। এজন্যই হযরত উমর রা. বলেছেন, এই আয়াত নাযিল হয়েছে বিশেষভাবে নবীজীর সাহাবীদের ব্যাপারে। হযরত উমর আরও একটি চমৎকার কথা বলেছেন, যদি আয়াতটি কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো, তাহলে 'কুনতুম খাইরা উম্মাতিন' না বলে 'আনতুম খাইরা উম্মাতিন' বলা হতো। এ দু'য়ের পার্থক্য আমি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া-য় সবিস্তারে লিখেছি। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কথা হল, আয়াতটি বিশেষভাবে সকল সাহাবীর জন্য নাযিল হয়েছে। তবে পরবর্তী লোকদের মধ্যে যারা সাহাবাওয়ালা আমল-আকীদার অধিকারী হবে, তাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। যেসব গোমরাহ ফেরকা আমল-আকীদায় সাহাবায়ে কেরামের পথে নেই তারা এর প্রয়োগস্থল বিবেচিত হবে না। আয়াতের পরবর্তী অংশ– تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ এর সমষ্টি হল ঈমান-আমল। কাজেই (নিজ দাবী ও রুচি অনুযায়ী নয়, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী) সাহাবাওয়ালা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার যার আমল হবে, আর সাহাবাওয়ালা ঈমান যার ঈমান হবে সে-ই হবে খায়রে উম্মত, সে-ই হবে আয়াতের মিসদাক বা প্রয়োগস্থল; অন্য কেউ নয়।

বলছিলাম, প্রথম স্তরের পূর্ণতা তো আল্লাহ তা'আলার দান, বিনা মেহনতেই আল্লাহ তাআলা তা প্রদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের পূর্ণতা অর্জনের জন্য মেহনত করতে হয়। ঠিক যেমন মানুষ একসময় শিশু থাকে, তখন তার শৈশবের জ্ঞান থাকে। তারপর যুবক হলে প্রাকৃতিকভাবেই যৌবনের জ্ঞান অর্জিত হয়। অতঃপর যখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তখন পৌঢ়ত্বের জ্ঞান এমনিতেই হাসিল হয়ে যায়। তারপর বুড়ো বয়সে হাসিল হয় বার্ধক্যের জ্ঞান।

বার্ধক্যের অভিজ্ঞতা

তবে বয়সের পার্থক্যের কারণে জ্ঞানেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। যৌবনের ইলম আর বার্ধক্যের ইলমে পার্থক্য আছে। প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতা আর বুড়োর অভিজ্ঞতায় বিস্তর ফারাক আছে। কেমন পার্থক্য? ফার্সি ভাষায় সিকান্দারনামা নামক একটি কিতাব আছে। সেখানে একটি ঘটনা আছে– একবার সিকান্দার যুলকারনাইন বিরাট একবাহিনী নিয়ে আবে হায়াত (সঞ্জীবনী সুধা) পান করতে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে একস্থানে গিয়ে তিনি সবাইকে থামিয়ে দিলেন এবং চল্লিশজন যুবককে বাছাই করে বললেন, কেবল এরাই আমার সঙ্গে বাকি পথ সফর করবে। কারণ এখন থেকে আমরা অন্ধকারে পথ চলব। আর জানা নেই সেখানকার পরিস্থিতি কি হবে। তিনি আরও ঘোষণা করলেন, কোন বৃদ্ধলোক আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। যাহোক, চল্লিশজন যুবক সঙ্গে নিয়ে সিকান্দার যুলকারনাইন রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে একসময় অন্ধকার পথ সামনে আসল। তিনি চিন্তা করলেন, আমরা এ পথে প্রবেশ তো করব কিন্তু অন্ধকারে তো দিক-দিশা কিছুই ঠাহর করতে পারব না যে, কোন পথে কোন দিকে যাচ্ছি। তাহলে শেষ পর্যন্ত যে পথে প্রবেশ করছি সে পথে ফিরে আসব কীভাবে? কিংবা পথে কোন অসুবিধা হলে দ্রুত নিরাপদে বের হব কীভাবে? কঠিন সমস্যা বটে। তিনি সবার কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু কারো মাথায় কিছু আসছে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরামর্শ হল, সমাধান পাওয়া গেল না। দলে এক

যুবক ছিল, বাপ তার বুড়ো হয়ে গেছে। দেখাশোনার কেউ নেই, কার কাছে রেখে যাবে? অগত্যা সে একটা কাঠের বাক্স যোগাড় করে বাপকে বাক্সবন্দী করে সঙ্গে নিয়ে নিল। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে, এতে আমার জরুরী সামানপত্র আছে। যুবক সবার অগোচরে প্রতিদিন রাতের বেলা বাপকে বাক্স থেকে বের করে তার খিদমত করে, খানাপিনা খাওয়ায়। এদিকে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বাহিনী কয়েকদিন একই স্থানে অবস্থান করছে। একদিন বুড়ো মিয়া ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে পড়ে আছো কেন, আগে বাড়ছো না কেন? ছেলে বলল, আব্বাজান! জটিল এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন ধরেই পরামর্শ হচ্ছে, কিন্তু সমাধান মিলছে না। সমস্যাটা হল, এখন থেকে আমাদেরকে অন্ধকারে পথ চলতে হবে। কিন্তু ফেরার সময় এপথেই যে ফিরতে পারবো তার নিশ্চয়তা কি? পথ হারিয়ে ফেলবো না? বাপ বললেন, সমাধান আছে। একটা গাভীন ঘোড়া যোগাড় করো। বাচ্চা প্রসব করার পর ঘোড়ার সামনেই বাচ্চাটিকে জবাই করো এবং তোমাদের প্রবেশপথের মুখে দাফন করে দাও। তারপর এই মা ঘোড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে সফর করতে থাকো। ফেরার পথে ঘোড়াটিকে সবার সামনে রেখে তাকে অনুসরণ করতে থাকবে, সে-ই তোমাদেরকে এ পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিবে, যে পথে তোমরা রওয়ানা হয়েছিলে। পরদিন পরামর্শসভায় যুবক এই রায় পেশ করল। পরামর্শ শুনেই সিকান্দার যুলকারনাইন বলে উঠলেন, আমি নিশ্চিত তোমার সঙ্গে কোন বৃদ্ধ আছে। জ্বী, পরামর্শের সুরতহাল শুনেই বলে দিলেন, তার সঙ্গে কোন বৃদ্ধ আছে। কারণ যুবকের মাথার ধারেকাছেও এই পরামর্শ আসতে পারে না। সিকান্দার যুলকারনাইন অভয় দিয়ে বললেন, যুবক! বলো তো তোমার সঙ্গে কে আছে? যুবক কাঁচুমাচু হয়ে স্বীকার করল, দেখাশোনার কেউ না থাকায় আমি আমার বৃদ্ধ পিতাকে বাক্সে ভরে নিয়ে এসেছি।

এ ঘটনা দ্বারা আমার বোঝানো উদ্দেশ্য, জওয়ানের ইলম আর বুড়ঢার ইলমে আসমান যমীন তফাৎ আছে। বৃদ্ধের যে অভিজ্ঞতা যুবক তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে না। বয়সের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানও বাড়তে থাকে, অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকে। এভাবেই ইলম বাড়তে থাকে। এমনকি কবরেও মানুষের ইলম বাড়তে থাকবে। তবে সেটা ন্যাচারাল নলেজ, প্রাকৃতিক জ্ঞান। কবরে গিয়েও জামি'আয় ভর্তি হয়ে সবক পড়তে হবে নাকি? আরে না, দুনিয়াতেও পিটুনি খেয়ে ইলম শিখছি, কবরে গিয়েও খেতে হবে? না, না, সেখানে পড়াশোনা করে ইলম হাসিল করতে হবে না, বিনা পড়ায় ন্যাচারালিই জ্ঞান বাড়তে থাকবে। হাশরের ময়দানেও স্বভাবজাত ইলম বাড়তে থাকবে। জান্নাতেও ন্যাচারালি ইলমে প্রবৃদ্ধি ঘটবে।

যে কুরআন শেখার চেষ্টা করে না সে পাঠকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে না

এই হাদীস তো আপনাদের সকলেরই জানা, কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে– يقال للقارئ اقرأ وارتق الدرج على قدر ما تقرأ من آي القرآن খেয়াল করুন, এখানে হাফেযে কুরআন বলা হয়নি, বলা হয়েছে يقال للقارئ কুরআনের কারীকে বলা হবে, কুরআনের কারী অর্থাৎ কুরআন পাঠকারী তো আমরা সবাই। এখন কেউ হয়তো দেখে পড়তে পারে, তাই দেখে দেখে পড়ে–সে-ও কুরআনের কারী অর্থাৎ পাঠকারী। হ্যাঁ, যে দেখে দেখেও পড়তে পারে না এবং শেখারও চেষ্টা করে না সে কারী অর্থাৎ পাঠকারী-র অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু যে-ই কুরআন পড়ে, চাই মুখস্থ পড়ুক আর দেখে পড়ুক, যদি দুনিয়ার জীবনে কুরআন পড়ে থাকে তাকে বলা হবে, اقرأ وارتق পড়তে থাকো, চড়তে থাকো। উস্তাদের কাছে না পাঠিয়েই তাকে বলা হবে, পড়তে থাকো, চড়তে থাকো। যেহেতু দুনিয়ার জীবনে কুরআন পড়েছে এজন্য জান্নাতে কারো ইয়াদ করিয়ে দেয়া ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় ইলম হাসিল হয়ে যাবে।

ভাইয়েরা! আমাদের মূল আলোচনা ছিল, আমাদের ইলম অর্জনের লক্ষ্য হল তাফাক্কুহ ফিদ্‌দীন হাসিল করা। দীনের সমঝ হাসিল করা। মাওলানা হওয়া, মৌলভী হওয়া নিঃসন্দেহে বড় বিষয় কিন্তু তা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। মৌলভী অর্থ আল্লাহওয়ালা। মৌলভী হওয়া অনেকটা সহজ। দরসিয়্যাত সমাপ্তকারী সকলেই আল্লাহওয়ালা; কিন্তু ফকীহ নয়। আল্লাহওয়ালা হওয়া মোটামুটি আসান। আমাদের দীনী মাদরাসা থেকে আট/দশ বছর পড়াশোনা করে যারা বের হয়, আলহামদুলিল্লাহ তারা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়। এদেরকে যদি আল্লাহওয়ালা বলা না হয় কিংবা এরা যদি আল্লাহওয়ালা না হয় তাহলে দুনিয়াতে আর আল্লাহওয়ালার সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভাই! দীনী মাদারেস থেকে শিক্ষাসমাপনকারী সবাই কিন্তু ফকীহ হয় না। সকলেই দীনের হাকীকত এবং গভীরতায় পৌঁছে দীনের বিশেষজ্ঞ হয় না। খুব অল্প সংখ্যক তালিবে ইলমই দীনের ফকীহ হয়। সেটাও আবার মাদরাসা থেকে বের হওয়া মাত্রই হাসিল হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করার পর ব্যক্তিগতভাবে দশ বছর, পনেরো বছর মেহনতের পর ইলম আসা শুরু হয় এবং একদীর্ঘকাল পর মানুষ ফকীহ হয়। তখন সে পুরো দীনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে; এর পূর্বে নয়। আমি প্রায়ই ছাত্রদেরকে বলে থাকি, আমাদের মাদরাসাগুলোতে ইলম বিতরণ করা হয় না, মাদরাসায় তো শুধু ইলম অর্জন করার যোগ্যতা পয়দা করে দেয়া হয়। মাদরাসা থেকে বের হওয়ার সময় যদি ইলম অর্জনের যোগ্যতা অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে এখন আপনাদের ফসল তোলার সময়। মেহনতে লেগে যান, মেহনতে লেগে থাকুন, সামনে গিয়ে ইলম হাসিল হবে। আর যদি যোগ্যতাই অর্জিত না হয় কিংবা হলেও 'ফাযেল হয়ে গেছি', 'ফারেগ হয়ে গেছি'র চক্করে পড়ে যান তাহলে হার্ডব্রেক পড়ে যাবে। তখন আর ইলম হাসিল হওয়ার কোন পথ খোলা থাকবে না। মোটকথা মাদরাসা থেকে বের হওয়ার পর যদি মৌলিক যোগ্যতা থাকে এবং যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে থাকে, তাহলে এক সময় ইলম আসা শুরু হবে।

ইলমে মানতেকের প্রয়োজন আছে কিনা?

এই মজমায় যেহেতু উলামায়ে কেরামও আছেন, এজন্য মাদরাসাওয়ালাদের যিম্মাদারী বিষয়ক কিছু কথাও বলা হবে। একজন তালিবে ইলম যে ইস্তিদাদ বা যোগ্যতা অর্জন করে তা আরো ধারালো ও শানিত করার যদি কিছু থাকে সেটা 'ইলমে মানতেক' (Logic বা তর্কশাস্ত্র)। ছাত্রদের ইস্তিদাদের ছুরিতে যদি মানতেকের ঘর্ষণ লাগে তাহলে ইস্তিদাদ ধারালো হতে থাকবে, শানিত হতে থাকবে। অতঃপর এই ছুরি দ্বারা সে যা ইচ্ছা কাটতে পারবে। পক্ষান্তরে ছুরিই যদি ভোঁতা হয় তাহলে তার দ্বারা তো তরমুজও কাটা যাবে না। মানতেক শাস্ত্রের একটি কিতাবের নাম সুল্লামুল উলূম। অর্থাৎ ইলমসমূহে আরোহনের সিঁড়ি। আজ সকালে এক প্রতিষ্ঠানে বয়ানের সময় আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখানকার মাদরাসাগুলোতে সুল্লামুল উলূম পড়ানো হয় কিনা? জবাব

আসল, কোন কোন মাদরাসায় পড়ানো হয়, বাকি সব জায়গা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। হ্যাঁ ভাই!, তারা সিঁড়িটিকেই বিদায় করে দিয়েছে! এর ফলাফল কী? সবাই লাফাচ্ছে আর লাফাচ্ছে কিন্তু ছাদে চড়তে পারছে না। চড়বে কেমন করে, এরা তো সিঁড়িটিকেই হটিয়ে দিয়েছে? যে তালিবে ইলম সুল্লামুল উলূম বুঝে শুনে পড়েনি তার ব্যাপারে আপনারা বড় কোন আশা করবেন না যে, সে ভাল কুরআন বুঝনেওয়ালা হবে, হাদীসশাস্ত্রে পণ্ডিত হবে, ফিকহে পারদর্শী হবে; কোন আশা রাখবেন না। কারণ সিঁড়ি ছাদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। যে তালিবে ইলম সুল্লামুল উলূমই পড়েনি কিভাবে সে ইলমের ছাদে আরোহন করবে? সে কিয়ামত পর্যন্তও সক্ষম হবে না। মানতেকশাস্ত্র নিদেনপক্ষে সুল্লামুল উলূম পর্যন্ত তো পড়া চাই। আমরা তো সুল্লামুল উলূমের পর এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ কাযী মুবারক পড়েছি, মোল্লা হাসান পড়েছি, হামদুল্লাহ পড়েছি। সুল্লামুল উলূমের তিন তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়েছি। মোল্লা হাসান তো দারুল উলূম দেওবন্দে আমি পনেরো বছর পড়িয়েছি। আজ আমরা এগুলোকে বেকার অভিহিত করছি। এগুলোকে যে বেকার মনে করে সে লাড্ডু খেয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। আসল ব্যাপার হল, الانسان عدو لما يجهل 'মানুষ অজানার শত্রু' ছাত্র তো ছাত্রই, আসাতিযা হযরতও আজ মানতেকের শত্রু হয়ে গেছে। তারাও এগুলোকে বেকার বলছে, নিষ্প্রোয়জনীয় বলছে, ফায়দাহীন বলছে। কেন ভাই? উত্তর আসে– 'আমরা নিজেরাই বুঝি না, ছাত্রদেরকে বোঝাবো কি?' আজ এসব কিতাব পড়ানোর লোকই বাকি নেই। আমি অধম দরসেই ইলমে মানতেকের সতেরোটি কিতাব পড়েছি। মানতেকের চৌদ্দটি কিতাব পড়ার পর পনেরো নম্বরে গিয়ে সুল্লামুল উলূম পড়েছি। এরপর পড়েছি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। যাহোক, বলছিলাম, মাদরাসায় আট/দশ বছর ধরে যে যোগ্যতা আমাদের মধ্যে পয়দা হবে সেটা ধারালো করার ইলম হল ইলমে মানতেক। এখন মাদরাসাগুলোতে এগুলো পড়ানোরই কেউ নেই, তো পড়বে কে? ফলে দীনের ফাক্বাহাত অর্থাৎ গভীরে প্রবেশ করে দীন বোঝা-ও আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। আজ কর্মবীর লোকের বড় অভাব। খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়েও 'কাজের' লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এদেশের কথা তো বলতে পারি না, আমাদের হিন্দুস্তানের অবস্থা হল, কোন মাদরাসার শাইখুল হাদীসের ইন্তেকাল হয়ে গেলে সেখানে আর শাইখুল হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না। শেষতক্ মুহতামিম সাহেবকে শাইখুল হাদীস বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। যে মুহতামিম সারা জীবনেও কিছু পড়েননি তাকেই শাইখুল হাদীস বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিছু না পড়েই তিনি বুখারী পড়ানো শুরু করে দিচ্ছেন। বলুন, যে নিজেই পড়েনি এমন মুহতামিমকে দিয়ে বুখারীর কী পড়ানো হবে? বলুন, এর দ্বারা কেমন প্রজন্ম পয়দা হবে?

আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয় ও উলামায়ে কেরামের চার যিম্মাদারী

কথা চলছিল আপনাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল তাফাক্কুহ ফিদ্দীন হাসিল করা। এরপর আপনাদের যিম্মাদারী কী হবে? দীনী মাদরাসা হতে শিক্ষাসমাপনকারীদের দায়িত্বাবলী কী হবে? শুনুন, আপনাদের যিম্মাদারী মোট চারটি।

এক. জাতির আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের তদারকি করা, খোঁজ-খবর নেয়া। তাদেরকে সতর্ক করা, ওয়াজ-নসীহত করা। তাদেরকে দীন বোঝানো এবং দীনের বুনিয়াদী ইলম পৌঁছে দেয়া। যেন জাতি মজবুত ঈমান ও সঠিক আকিদা-বিশ্বাসের ওপর উঠতে পারে। وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ আমরা জাতিকে বোঝাতে থাকলে তাদের আকীদা সহীহ হবে, আমল সহীহ হবে। আজ আমাদের অবস্থা কি? আমরা মসজিদের ইমাম, মাদরাসার ফাযেল কিন্তু মসজিদ এলাকায় কোনদিন ভুলেও কোন যুবককে জিজ্ঞেস করি না–ভাই! আপনি কি নিয়মিত নামায পড়েন? তবে গোপনে জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি না পড়ে তাকে নামাযের দাওয়াত দিতে হবে। গোটা মহল্লার প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে হবে। মসজিদে না আসলে, নামায না পড়লে তাকে মসজিদে আসার কথা, নামাযের কথা বলতে হবে। নামায পড়তে না জানলে শেখাতে হবে। ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি এই যিম্মাদারী পালন করেন কিনা? তিনি উত্তর দিবেন, এটা আমার দায়িত্ব নয়, আমার দায়িত্ব তো কেবল নামায পড়ানো। আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলছেন وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ অথচ ইমাম সাহেবগণ সাফ বলে দেন, আমার দায়িত্ব নয়। তাহলে জনাব! এটা কার যিম্মাদারী? কার দায়িত্ব? কেউ আবার বলে, এটা তাবলীগওয়ালাদের যিম্মাদারী। ভালো কথা, এটা তাবলীগওয়ালাদের যিম্মাদারী কিন্তু আপনি কেন তাবলীগওয়ালা হচ্ছেন না? তাবলীগওয়ালারা কি আকাশ থেকে নেমে আসে? তাবলীগ তো এই উম্মতের যিম্মাদারী। যখন প্রতিটি মসজিদের ইমাম নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী মসজিদ-মহল্লায় তাবলীগওয়ালা বনে যাবে, প্রতিটি যুবক-বৃদ্ধের নামায সহীহ করে দিবে, তাদেরকে নামায শেখাবে তখন ভেবে দেখুন, তাবলীগওয়ালাদের কাজ কতোটা সহজ হয়ে যাবে। যাহোক, আমাদের প্রথম যিম্মাদারী হল, জাতিকে সামলানো। কোন জাতিকে সামলাবো? সেই জাতিকে যাদের আকীদাও সহীহ আছে, আমলও সঠিক আছে কিন্তু বে-আমল হয়ে গেছে। এদেরকে আমলের ওপর নিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য। অনেক আগের কথা। একবার সাহারানপুর এলাকায় মুশা'আরা (কবিতার আসর) বসল। এক মহিলা কবিও এতে অংশগ্রহণ করল। পুরুষদের মুশা'আরায় সে-ও গজল পরিবেশন করল। সে যুগে যেহেতু এ ঘটনা একেবারেই নতুন ছিল, সুতরাং একটা হৈ-হাঙ্গামা বেধে গেল। একপর্যায়ে কিছু লোক আমার কাছেও আসল যে, জনাব সর্বনাশ হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন কী হয়েছে? বলল, সাহারানাপুরে এই এই হয়েছে এখন এই মহিলাকে বুঝাতে হবে, আপনি চলুন। আমি বললাম, বোঝাবুঝির কোন প্রয়োজন নেই, আপনারা আমাদের এ বোনটিকে জায়নামাযে দাঁড় করিয়ে দিন, সে নিজে থেকেই চুপসে যাবে। আপনারা তাকে বলবেন না যে, তুমি এগুলো বন্ধ কর। আপনারা মেহনত করে কেবল তাকে জায়নামাযে দাঁড় করিয়ে দিন, স্টেজে দাঁড়ানো থেকে সে আপনা-আপনিই বিরত থাকবে। কাজেই মহল্লায় যদি এমন কিছু লোক থাকে তাহলে আপনি নেতিবাচক মেহনত পরিত্যাগ করুন। কাউকে বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দিন বলার দরকার নেই। আপনি তাকে পাবন্দির সাথে মসজিদে এসে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী বানিয়ে দিন। ধীরে ধীরে সে চুরি করা ছেড়ে দিবে, মদ খাওয়া ছেড়ে দিবে, ধোঁকাবাজি প্রতারণা স-ব ছেড়ে দিবে। আপনি ইতিবাচক পন্থায় মেহনত করতে থাকুন لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ নিজে নিজেই সে মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে। এই দেশে প্রতি বছর শত শত মাদরাসা থেকে হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষাসমাপন করে বের হচ্ছে। যদি প্রতিটি ফাযেল এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমি প্রতি বছর কমপক্ষে দশজন করে লোককে নামাযী

বানাবো, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো দেশের চিত্র পাল্টে যাবে। হাজার হাজার মসজিদ আবাদ হবে। লক্ষ লক্ষ লোক দীনদার হয়ে যাবে।

যে তিন যিম্মাদারী শুধু প্রাজ্ঞ আলেম কর্তৃক পালন করা সম্ভব

হাদীস শরীফে নবীজীর পক্ষ হতে আপনাদের আরও তিনটি দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। তা হল, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين 'এই ইলমে দীন অর্জন করবে প্রতেক প্রজন্মের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ।' এটাই দুনিয়ার নিয়ম। প্রতি পঞ্চাশ/ষাট বৎসরে এক একটি জেনারেশন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। পরবর্তী জেনারেশন তাদের স্থান দখল করে। এভাবে জেনারেশনের আগমন-নির্গমন চলছেই। তো প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের যারা সবচেয়ে ভালো মানুষ তারাই ইলমে দীন হাসিলের সুযোগ পায়। ইলম অর্জন করে তারা কী করবে? হাদীসে তিনটি কাজের কথা বলা হয়েছে।

এক. ينفون عنه... وتأويل الجاهلين 'যে সকল মূর্খ কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে–যেমন আজকাল জাকির নায়েক নামক এক বেওকুফের আবির্ভাব ঘটেছে। আগে সে গায়রে মুকাল্লিদ ছিল। তারপর উন্নতি করতে করতে এখন এতোটাই বেড়ে গেছে যে, গায়রে মুকাল্লিদরাও তাকে নিয়ে পেরেশান। না পড়েই সে গোটা কুরআন-সুন্নাহ বুঝে ফেলেছে! প্রশ্ন করতে দেরি পটাপট সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। শুরু থেকেই সে কুরআন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে। ভাবটা এমন যে, ইসলাম সে একাই বুঝে ফেলেছে। তো এই সব মূর্খ কুরআন-হাদীসের যে ভুল ব্যাখ্যা করছে এগুলোকে দূর করা, হটিয়ে দেয়া এবং লোকদেরকে একথা বোঝানো যে, এরা ভুল করছে, এরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা করছে তার মর্ম ওটা নয়, হাদীসের যে ব্যাখ্যা করছে তা প্রকৃত ব্যাখ্যা নয় বরং আয়াতের সঠিক মর্ম এই, হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা এই–এটা উলামায়ে কেরামের যিম্মাদারী। মূর্খ লোকের অপব্যাখ্যা বোঝাতে গিয়ে আমি একটা তাজা দৃষ্টান্ত পেশ করলাম। একটা পুরনো উদাহরণও নিন। বেরেলভীদের বক্তব্য হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ নন, তাকে মানুষ বলা সঠিক নয়। তাদেরকে বলুন, স্বয়ং কুরআনে কারীমই তো বলছে,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ.

অর্থ : হে নবী আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতই মানুষ। (তবে এমন মানুষ যে,) আমার কাছে ওহী আসে, (আর তোমাদের কাছে আসে না। অর্থাৎ মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে আমি আর তোমরা সমান। পার্থক্য হল, আমার কাছে ওহী আসে আর তোমাদের কাছে আসে না।) এই হল, আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা। এবার দেখুন বেরেলভীদের ইমাম আহমদ রেযাখান কী লিখেছেন? তিনি লিখেছেন, আয়াতে বর্ণিত 'ইন্নামা' শব্দটির ইন্না অংশটি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর 'মা' অংশটি না সূচক। ফলে অর্থ হবে, 'আপনি বলে দিন, নিশ্চয় নই আমি তোমাদের মত মানুষ। অর্থাৎ আমি মানুষ বটে কিন্তু ভিন্ন ধরণের মানুষ; ফেরেশতাদের মত মানুষ, আল্লাহ মিয়ার মত মানুষ।' এটা হল মূর্খদের ব্যাখ্যা। তাদেরকে বলুন, আলোচ্য বাক্যের সাথেই তো 'ইন্নামা' শব্দযোগে আরেকটি বাক্য আছে–أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِد তো এবার দেখান না জনাব 'ইন্নামা'র কারিশমা! এবং করেন না তরজমা–'নিশ্চয় নই আমি তোমাদের এক ও একক মাবূদ। কেননা আমি তো খ্রিস্টানদের 'তিনখোদার' জগাখিচুড়ি, লাড্ডু।' কেন, ওখানে ইন্নামা-র ওই তরজমা করতে পারলে এখানে পারবেন না কেন? হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কায়? এমন সুস্পষ্ট বাস্তবতা সত্ত্বেও দেখুন, মাথামোটাটা তরজমা করেছে–নবীজী নাকি আমাদের মতো মানুষ নন, ফেরেশতাদের মতো মানুষ। এটা জাহেল-মূর্খদের কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা। এসব অপব্যাখ্যা দূর করা, হটিয়ে দেয়া এবং লোকদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা আপনাদের যিম্মাদারী।

দুই. দ্বিতীয় কাজ হল, وانتحال المبطلين বাতিল ও ভ্রান্ত ফেরকার লোকেরা মাঝে মধ্যে যেসব মিথ্যা দাবী করে সেসব দাবীর অসারতা প্রমাণ করা। এটাও আপনাদের যিম্মাদারী। এর উদাহরণ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। তার দাবী হল, সে নাকি নবী, এমনকি সকল নবীর সেরা নবী এবং সর্বশেষ নবী। এটাই হাদীসে বর্ণিত ইনতিহাল অর্থাৎ ভ্রান্ত দাবী। ইনতিহাল-এর মর্ম আপনারা মুখতাসারুল মা'আনী কিতাবে পড়েছেন যে, অন্যের রচিত কবিতা/সাহিত্য নিজের রচনা বলে দাবী করা অর্থাৎ অন্যের জিনিসকে 'আমার' বলে পেশ করাকে ইনতিহাল বলা হয়। তো বাতিলপন্থিরা এভাবে ইনতিহাল করতে থাকে যে, আমি নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ নবী ইত্যাদি। বলুন, এদেরকে কে বোঝাবে? আপনাদেরকেই বোঝাতে হবে, আপনাদেরকেই সংশোধন করে দিতে হবে।

যে এলাকায় বাঘ থাকে শেয়াল সেখানে বাহাদুরি করতে পারে না। যদি প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি এলাকায় আপনারা প্রস্তুত থাকেন এবং কাদিয়ানীদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ ছিড়তে ওঁৎ পেতে থাকেন তাহলে আপনার এলাকায় কাদিয়ানী ফেতনা ঢুকবেই না। কাদিয়ানী ফেতনার উদাহরণ কচ্ছপের মতো। কচ্ছপের বৈশিষ্ট্য কী? যখন গোটা পরিবেশ নীরব থাকে, কোন সাড়াশব্দ থাকে না, তখন সে পুরো চার পা মাথাসহ বের করে দেয় এবং চলতে শুরু করে। যেখানে কোনরকম সাড়াশব্দও থাকে সেখানে তার পা মুখ সব ভেতরে। তো এই ফেতনাটি কচ্ছপের মতো। যদি তার জানা থাকে, এই এলাকায় বাঘ আছে, কোন আলেমে দীন আছে এরা সেখানে পা-ই বের করতে পারে না, সেখানে থাকতেই পারে না। আর যেখানে দেখবে, পুরো এলাকা দীনের দাঈ থেকে খালি, বাধা দেওয়ার কেউ নেই সেখানে তারা ফেতনার সয়লাব বইয়ে দেয়। মানুষকে গোমরাহ করার জন্য তাদের কাছে সম্পদও আছে, নারীও আছে। ঠিক যেমন খ্রিস্টান মিশনারীরা সম্পদ আর নারীর মাধ্যমে তাদের আন্দোলন সফল করে থাকে। কাদিয়ানীরাও এ দু'টোর মাধ্যমে তাদের কাজ হাসিল করে। যেখানে আমাদের কোন ফাযেল থাকে না, সেখানে এই দু'য়ের খপ্পর থেকে সাধারণত কেউ বাঁচতে পারে না।

তিন. ينفون عنه تحريف الغالين কট্টরপন্থী লোকেরা দীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে। কট্টর লোকের স্বভাবই হল, তারা দীনের সীমারেখায় সন্তুষ্ট থাকে না, ডিঙিয়ে যায়। দীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটিয়ে সীমালঙ্ঘন করে। এ সকল বিকৃতি সংশোধন করাও আপনাদের যিম্মাদারী। এজন্য সর্বপ্রথম আপনাদেরকে দীনের সীমারেখা জানতে হবে। কুরআন-সুন্নাহয় প্রতিটি আমলের যে সীমারেখা বাতলে দেয়া হয়েছে তা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তবেই আপনি কট্টরপন্থীদের সীমা অতিক্রমের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন এবং তাকে বোঝাতে ও থামাতে পারবেন। এর প্রচুর উদাহরণ আছে। এই যে বেরেলভী ভাইয়েরা, এরা নবীজীকে

ভালোবাসার ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা নবুওয়াতী মর্যাদার আইল ঠেলে খোদায়ী মর্যাদার আইল নষ্ট করে দিয়েছে। আইল বোঝেন তো! গ্রাম এলাকায় প্রতিটি জমির একটা সীমানা থাকে, উর্দূতে এটাকে 'ডান্ডা' (বাংলায় আল বা আইল) বলা হয়। তো আইলের একদিকে থাকে এই জমির সীমানা, আর অপরদিকে ওই জমির সীমানা। আইলটা মাঝখানে থেকে দুই জমির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। সচেতন কৃষক চাষবাস করার সময় পুরো জমিতে লাঙল চালালেও আইলটাকে সযত্নে অক্ষুণ্ন রাখে। তো এই বেরেলভীরা আইল ভেঙ্গে দিয়েছে। তারা নবীজীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের মতো কাজ করেছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘন করেছে। তাকে 'তিন খোদা'র এক খোদা বানিয়ে নিয়েছে। ঠিক তদ্রুপ বেরেলভীরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে সীমালঙ্ঘন করেছে। সীমালঙ্ঘনকে মহব্বত বলে না? এতই যদি নবীর মহব্বত তাহলে তো নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা ছিল। না, তারা নামাযে যত্নবান নয়। তারা কি নিজেদের চেহারাকে নবীর চেহারার মতো বানিয়েছে? না, তাদের অধিকাংশেরই চেহারায় দাড়ি নেই। বছরে একবার মীলাদুন্নবী পালন করেই ব্যস, নবীর সঙ্গে খাতির-মহব্বত সব হয়ে গেছে। এটা সীমালঙ্ঘন। এরা নবীজীকে মন-মতলবী মহব্বত করতে করতে কোথায় পৌঁছে গেছে? আল্লাহ তা'আলার যত ধরণের ইলম আছে, যত পরিমাণে ইলম আছে সম পরিমাণ ইলম তারা নবীজীর জন্যও সাব্যস্ত করেছে। তাদের মতে আল্লাহর ইলম আর নবীজীর ইলম প্রায় একসমান। নাউযুবিল্লাহ।

দক্ষতা দুই প্রকার

হযরত নানুতবী রহ. তার এক কিতাবে লিখেছেন, কামালাত বা দক্ষতা দুই প্রকার। এক. কামালে ইলমী বা জ্ঞানগত দক্ষতা। দুই. কামালে আমলী বা কর্মগত দক্ষতা। এ দু'টোর মধ্যে কামালে ইলমী উন্নত স্তরের। আর কামালে আমলী পরবর্তী স্তরের। উদাহরণত বাঘ-হাতির মধ্যে যে দক্ষতা সেটা কামালে আমলী; ওদের শক্তি ও ক্ষিপ্রতা মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি। আর মানুষের মধ্যে যে দক্ষতা সেটা কামালে ইলমী; মানুষ তার বুদ্ধির জোরে বাঘের নাকে দড়ি পরায়, হাতির ওপর ছড়ি ঘোরায়। ইলমী কামাল আল্লাহ তা'আলার একটি সিফাত বা গুণ। তিনি আলিমুল গায়ব ওয়াশ শাহাদা– অদৃশ্য দৃশ্য সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। এখন আল্লাহ তা'আলা যদি এই পুরো ইলমী কামাল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করে থাকেন–লে হালুয়া–তাহলে নবীজীর আর মাবুদ হতে বাধা কোথায়? আল্লাহ তা'আলাও যেমন মাবুদ, নবীজীও তেমন মাবুদ। এর ভ্রান্তি তো একেবারেই সুস্পষ্ট, কিন্তু জাহেলদের মাথায় এটা জেঁকে বসেছে। তাদের মস্তিষ্ক থেকে এগুলো নিষ্কাশন করা আপনাদের যিম্মাদারী।

তো এ চার যিম্মাদারী উলামায়ে কেরামের। প্রথমত: জাতিকে সামলানো। তাদের মধ্যে সকল ইতিবাচক পন্থায় মেহনত করা। নেতিবাচক পন্থায়ও মেহনত করা। তবে ইতিবাচকের চেয়ে কিছুটা কম। ইতিবাচক পন্থায় বেশি মেহনত করা। দেখুন, লোকেরা তাবলীগওয়ালাদের সমালোচনা করে যে, তারা মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয় না। কুরআনে তো আমর বিল মারূফ এবং নাহি আনিল মুনকার দু'টোর কথাই আছে, কিন্তু তাবলীগওয়ালারা শুধু ভাল কাজ করতে বলে, মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয় না। আসলে মন্দ কাজে বাধা দেওয়ারও নিয়ম-পদ্ধতি আছে। আপনি যখন কারও ওপর ইতিবাচক পন্থায় মেহনত করবেন সে মসজিদে আসবে, দীনের মূল্য বুঝবে, আল্লাহ তা'আলাকে চিনবে, অতঃপর ধীরে ধীরে একপর্যায়ে সে নিজ উদ্যোগেই মন্দ কাজ থেকে সরে আসবে। এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। পক্ষান্তরে প্রথম পর্যায়েই যদি আপনি তার মন্দ কাজে বাধা দেন তাহলে সে কোনদিনই মসজিদে আসবে না। এজন্যই আমি বলেছি, নেতিবাচক পন্থার তুলনায় ইতিবাচক পন্থায় মেহনত বেশি করবেন। আর বাকি তিনটি করণীয় এমন যা সকল আলেম করতে পারে না। কেবল সেই আলেমই করতে পারে যার দীনের ফিকহ হাসিল আছে। প্রশ্ন হল এমন আলেম কে? জানা কথা যে, এর জন্য আসমান থেকে কোন ফেরেশতা নেমে আসবে না। এই যোগ্যতা আপনাকেই অর্জন করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের মস্তিষ্কে 'ফারেগ হয়ে গেছি'-এর ভূত ঢুকে গেছে। আমরা মনে করছি 'ফাযেল' যখন হয়ে গেছি আমার তো সবই হাসিল হয়ে গেছে! প্রিয় ভাইয়েরা! কোন মানুষই সবকিছু হাসিল করতে পারে না। এটা মানুষের সাধ্যাতীত।

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা শিক্ষার পার্থক্য

দেখুন, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং আমাদের দীনী মাদরাসার শিক্ষা-দীক্ষার পার্থক্য হল, তাদের কাছে বস্তু বিষয়ক নানারকম জ্ঞান আছে। আর আমাদের আছে মা'নাবিয়্যাত তথা ঊর্ধ্বজাগতিক তাত্ত্বিক জ্ঞান। দ্বিতীয় পার্থক্য হল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়ারা ডিগ্রি অর্জন করেই চাকরী-বাকরী শুরু করে দেয়, তাদের আর পড়াশোনার কিছু বাকি থাকে না। পক্ষান্তরে আমাদের এখানে উলূমে আকলিয়া পড়ানো হয়, মা'নাবিয়্যাত পড়ানো হয়। মা'নাবিয়্যাত শেখা শেখানোর পেছনে একটা দীর্ঘ সময় ব্যয় করা হয়। ফলে ধীরে ধীরে জ্ঞানে পরিপক্কতা আসতে থাকে। কুরআনে কারীমও মা'নাবিয়্যাত, হাদীস শরীফও মা'নাবিয়্যাত, ফিকহও মা'নাবিয়্যাত। অনুরূপভাবে এ তিন শাস্ত্রের মূলনীতি– উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস এবং উসূলে ফিকহ এগুলোও মা'নাবিয়্যাত। মোটকথা, মাদরাসার জীবনে একজন তালিবে ইলমকে শুধুমাত্র ইলম অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। অতঃপর মাদরাসা থেকে বের হয়ে তাকে অনবরত অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় জারি রাখতে হয়। এভাবে এক দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর তার মধ্যে সত্যিকার ইলম আসতে থাকে। এরপর গিয়ে সে উক্ত তিন কাজ করার পজিশনে পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে দিন এবং সময় থাকতে সেগুলো শোধরানোর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের তাওফীক দিন। আমীন।

[২০১০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সফরে আরজাবাদ মাদরাসায় উলামা তুলাবাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ]

অনুবাদ : মুহাম্মদ আবূ সাইম
ইমাম ও খতীব, বছিলা বড় মসজিদ, মুহাম্মাদপুর ঢাকা

লা-মাযহাবীদের মাযহাব

মুফতী সাঈদ আহমাদ

আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা যদিও মুখে বলে থাকেন যে, তারা সরাসরি কুরআন-হাদীস অনুসরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো কথায় আমল করেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে তাঁর দীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কাজেই অন্য কারো কথা শোনার তো কোন প্রয়োজনই নেই। বরং অন্য কারো কথা মানলে শিরক হয়ে যাবে, ঈমান চলে যাবে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

প্রিয় পাঠক! তাদের এ বক্তব্য অবাস্তব এবং অসম্ভবও বটে। বাস্তবতা হল, তারাও মাযহাব অনুসরণ করে। তাদেরও অঘোষিত কিছু ইমাম এবং কিছু মাযহাব বরং অসংখ্য ইমাম ও অসংখ্য মাযহাব রয়েছে। রসুনের কোয়ার মত প্রায় সবগুলোর গোড়া একটি সামষ্টিক চিন্তাধারায় গিয়ে মিলে। তারা সরাসরি কুরআন-হাদীস বোঝে এবং নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী আমল করে, একথা শতভাগ মিথ্যা। নিম্নের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন তারা কীভাবে জন্মান্ধের মত অন্যের কথা মান্য করে আর মুখে বলে আমরা কারো তাকলীদ (অনুসরণ) করি না।

এক. আমাদের এক সুপরিচিত আহলে হাদীস ভাই চলনে-বলনে যাকে একজন যবরদস্ত আলেম মনে হয়। তিনি রুকূ থেকে উঠেও দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত তোলেন এবং পুনরায় বুকের উপর বাঁধেন। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রুকূ হতে উঠে সিজদায় যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হাত বাঁধাটা কোন্ সহীহ হাদীসে আছে? খুব বিনীত হয়ে বললেন, হুযূর! আমি তো কোন হাদীস জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে হাত বাঁধলেন কেন? তিনি বললেন, আমি আঠারো বছর সৌদি আরবে ছিলাম। সেখানে আমাদের শাইখকে এভাবে বাঁধতে দেখেছি। বললাম, তো শাইখকে জিজ্ঞাসা করেছেন কি এটা কোন হাদীসে আছে? তিনি বললেন, না, কখনো জিজ্ঞেস করিনি। আমি বললাম, তো এটা কি শাইখের তাকলীদ করে শিরক করা হয়ে গেল না! তিনি নিরুত্তর হয়ে হাঁটা ধরলেন।

প্রিয় পাঠক! কিছুদিন সৌদি আরবে থেকে অথবা টেলিভিশন দেখে আর ইন্টারনেট ঘেঁটে কিংবা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হয়ে আমাদের দেশের অনেকেই নিজেকে আহলে হাদীস দাবী করে। অথচ সূরা ফাতিহাও সহীহ করে পড়তে পারে না। হাদীসের একটি লাইনও পড়তে পারে না। বিবেক ঠিক থাকলে বলুন, এরা কি মুহাদ্দিস, নাকি মুকাল্লিদ?

দুই. আরেক আহলে হাদীস ভাইয়ের সাথে আমার সাথীরা প্রায়ই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। সে সাথীদেরকে বলে, আরে, আপনারা অন্যের কথা ধরবেন কেন? সব তো কুরআন-হাদীসে আছেই। নিজেই পড়ুন এবং সরাসরি কুরআন-হাদীস অনুসরণ করুন। একদিন সাথীরা আমাকেও ডেকে তাদের কাছে বসতে অনুরোধ করল। আমি বসে আহলে হাদীস ভাইকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলতে লাগলেন, আমি আমাদের হুযূরকে আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো। আমি বললাম, আপনার হুযূর আবার কে? আপনি তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোন হুযূরকে মানতে পারেন না। যেহেতু আপনি তাকলীদ করেন না। তো আপনি আপনার হুযূরকে মানতে পারলে আমার এ সাথীরা কোন হুযূরকে মানলে সমস্যা কী? আপনার হুযূরের প্রতি কি ওহী নাযিল হয়? সেদিনের পর থেকে তাকে আর তর্কের আসর বসাতে দেখি না।

তিন. সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় সকল কিতাবে সহীহ সূত্রে বহু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে এমন একজন লোক অবশিষ্ট থাকতে কিয়ামত কায়েম হবে না, যে বলবে 'আল্লাহ আল্লাহ'। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৮৭)

এ হাদীসে 'আল্লাহ আল্লাহ' শব্দের যিকির করার বৈধতা এত স্পষ্টাকারে প্রমাণিত হয় যা অস্বীকার করা বিবেকের সাথে খেয়ানত করার নামান্তর। এছাড়া আল্লাহর নামে বেশি বেশি যিকির করার আদেশ সংবলিত আয়াতসমূহ তো আছেই।

এতদসত্ত্বেও আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা বলে বেড়ায় যে, শুধু আল্লাহর নামের যিকির করা জায়েয নেই। এটা নিশ্চয় কোন অজ্ঞ লোকের অন্ধ অনুসরণে বলে থাকে। অন্যথায় সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করলে তো এমন ভুল বলার কথা নয়।

চার. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এমন এক শাশ্বত কালিমা যা মুসলিম উম্মাহর ঈমানের প্রথম বুনিয়াদ হিসেবে পঠিত হয়ে আসছে ইসলামের শুরু থেকে আজ অবধি। মুসলিম উম্মাহ উক্ত কালিমাকে কালিমায়ে তাইয়িবা নামে আখ্যায়িত করে। গোটা মুসলিম উম্মাহর নিরবিচ্ছিন্ন সূত্রে এ কালিমা এ পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইসলামের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কালিমা হল এটি। কুরআন জানে না, হাদীস জানে না, অন্য কোন কালিমা জানে না, শরীয়তের অন্য কোন বিধান জানে না কিংবা আমল করে না এমন মুসলমান থাকতে পারে; কিন্তু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' জানে না ও পাঠ করে না এমন কোন মুসলমান এ পৃথিবী নামক গ্রহে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু দেখুন, আহলে হাদীসদের মতবাদ। তারা বলে, এটা নাকি কুফরী কালিমা; নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। বাইতুল্লাহর গিলাফ, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর দেয়ালে, পিলারে, বাতিতে, সাম্প্রতিককালে নির্মিত মক্কার ঘড়ি টাওয়ারেও এই কালিমা লিখিত ও অঙ্কিত আকারে বিদ্যমান। এমন প্রামাণ্য কালিমার জন্য ফের হাদীসের প্রমাণ তালাশ করাই তো ধৃষ্টতা। এরপরও নিম্নোল্লিখিত হাদীসটি উল্লেখ করছি, আহলে হাদীসদের মিথ্যা নামের মুখোশ উন্মুক্ত করার জন্য-

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال انطلق أبو ذر ونعيم بن عم أبي ذر وأنا معهم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستتر بالجبل فقال به أبو ذر يا محمد أتيناك لنسمع ما تقول قال أقول لا اله الا الله محمد رسول الله

فآمن به أبو ذر وصاحبه.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আবূ যর ও তার চাচাতো ভাই নু'আইম চললেন এবং আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের আঁড়ালে ছিলেন। আবূ যর হুযূরকে দেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যে কথা বলেন তা আমরা শুনতে এসেছি। জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বলি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এতদশ্রবণে আবূ যর ও তার চাচাতো

ভাই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করল। (আল-ইসাবা ফী তামঈযিস সাহাবা ৬/৪৬৩)

প্রিয় পাঠক! এ হাদীসটি নিশ্চয় কথিত আহলে হাদীস ভাইদের জানা নেই। কারণ হাদীসের ব্যাপারে তারা তোতা পাখি। গুরুদের পক্ষ থেকে যা শেখানো হয়, তা তাদের পুঁজি। এর বেশি জানার ও বলার ক্ষমতা তাদের নেই। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমের নাম নেয় সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। এরা মূলত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমও মানে না। পূর্বে 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকিরের ক্ষেত্রে যেমন সহীহ মুসলিমের হাদীস তাদের চোখে পড়েনি, অনুরূপ সামনের হাদীসসমূহেও এর প্রমাণ পাবেন।

পাঁচ. শরীয়ত মতে কোন স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া বৈধ নয়। কারণ একান্ত প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে এক তালাকই যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও কোন লোক তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হয় এবং স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। বিষ খাওয়া বৈধ নয়; তা সত্ত্বেও রাগে, অভিমানে ঝগড়া করে কিংবা ঠাট্টা করে বিষ খেয়ে ফেললে যেমন মানুষ মারা যায় তেমনিভাবে যে কোন অবস্থায় একসঙ্গে তিন তালাক দিলেও বিবাহ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায় এবং তিন তালাকের বিধান কার্যকর হয়। এ ব্যাপারে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে বর্ণনার যেমন অভাব নেই তেমনি খোদ সহীহ বুখারীতেও এ মর্মে হাদীসের আকাল নেই। নিম্নের হাদীস দু'টি লক্ষ্য করুন-

'হযরত উআইমির রাযি. ও তার স্ত্রী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে লি'আন করলেন। লি'আন শেষে হযরত উআইমির রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লি'আনের পরও যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তাহলে আমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলার পূর্বেই তিনি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবনে শিহাব রহ. বলেন, সেই থেকে এটা লি'আনকারী দম্পত্তির নীতি হিসেবে স্বীকৃতি পেল।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৫৯)

'হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ করল এবং বিবাহের পরপরই সে স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস না করে তালাক দিলে তাতে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৬১)

এ-তো হল সহীহ বুখারীর হাদীস। ইমাম বুখারী রহ. হাদীস দু'টি এনেছেন একসাথে তিন তালাক প্রদানের শিরোনামে একই অনুচ্ছেদে। এছাড়া সাহাবীগণের আমল দেখুন,

(ক) 'হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন রাযি. কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে নিজ স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছে। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি নিজ প্রভুর নাফরমানী করেছে এবং তার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ১৮০৮৮)

(খ) 'হযরত উমর রাযি. এর নিকট যদি এমন লোককে হাজির করা হত, যে নিজ স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছে, তাহলে তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন এবং স্বামী থেকে স্ত্রীকে পৃথক করে দিতেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ১৮০৮৯)

প্রিয় পাঠক! স্পষ্টত বুঝতে পারলেন যে, সহীহ বুখারীর হাদীস এবং সাহাবীগণের আমলের সাথে আহলে হাদীস ভাইদের কথায়-কাজে কোন মিল নেই। নিশ্চয় তারা এখানে হাদীস ও সাহাবীগণের আমল বর্জন করার ক্ষেত্রে কোন অযোগ্য লোকের তাকলীদ করে থাকে। এক্ষেত্রে কিছু নাদান আহলে হাদীস একটি বর্ণনার মর্ম ভুল বুঝে তিন তালাকের মাসআলাটি হযরত উমর রাযি. এর বিদআত আখ্যা দেয়ারও চেষ্টা করে (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত উমর রাযি. কে বিদআতী আখ্যা দানকারীর কথা যে বিশ্বাস করবে তার মত পঁচা মুকাল্লিদ চার মাযহাবের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ছয়. সহীহ বুখারী; হাদীস নং ৬২৬৫। (অর্থ) 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সূরা শেখানোর ন্যায় তাশাহুদ শিখিয়েছেন। তখন আমার হাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'হাতের মাঝে ছিল...।

ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীস দ্বারা দু'হাতে মুসাফাহা প্রমাণ করেছেন। এ কারণে 'বাবুল মুসাফাহা' তথা মুসাফাহার অনুচ্ছেদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর কথাটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর পরবর্তী অনুচ্ছেদে মুসাফাহায় দু'হাত ধরা শিরোনামেও এ হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের পরস্পরে দু'হাতে মুসাফাহা করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত সহীহ হাদীস ও ইমাম বুখারী রহ. এর এত স্পষ্ট সমর্থনের পরেও যারা একহাতে মুসাফাহার কথা বলে তাদের কি সহীহ বুখারীর দোহাই দেয়ার কোন অধিকার আছে? তারা কি সহীহ হাদীসের অনুসারী? নিশ্চয়ই না। এরা মূলত হাদীস, সহীহ হাদীস কিংবা সহীহ বুখারীর অনুসারী নয়; বরং কোন চরম ফিতনাবাজ অথবা নেহায়েত মূর্খ লোকের তাকলীদ করে, যে তাকলীদ ইসলাম ও সুস্থ বিবেক পরিপন্থী।

সাত. আহলে হাদীসদের হাদীস চর্চা অন্ধের হাতি দেখার মত। অন্ধ যেমন হাতির দাঁতে হাত দিয়ে বলে, হাতি মুলার মত আর কানে হাত দিয়ে বলে, হাতি কুলার মত; গোটা হাতির অনুমান সে কখনো করতে পারে না। অনুরূপ দু-চারখানা হাদীস পড়ে কিংবা কোন আহলে হাদীসের তাকলীদ করে আহলে হাদীস হলে তার কী পরিণতি হয় তা বোঝার জন্য টুপি মাথায় দেয়ার বিষয়টিই যথেষ্ট। টুপি নিয়ে তারা কয়েক ফেরকায় বিভক্ত। অধিকাংশ আহলে হাদীসরা টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়ে না। কারণ টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়ার কথা নাকি হাদীসে বর্ণিত নেই। অথচ ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে নামাযের পোশাকাদীর অধ্যায়ে টুপি সংক্রান্ত হাদীস এনেছেন। যেমন,

'হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল যে, ইহরাম অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র কী হবে? জবাবে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোর্তা, পায়জামা, টুপি, জাফরান বা কুসুমের রং করা কাপড় পরবে না। আর যে ব্যক্তি চপ্পল না পেয়ে চামড়ার মোজা পরবে সে যেন উপরের অংশ কেটে নেয়, যেন টাখনুদ্বয় উন্মুক্ত থাকে।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬৬)

এ হাদীসে ইহরাম অবস্থায় টুপি পরতে নিষেধ করলেও অন্য সময়ে টুপি যে পোশাকের অন্তর্ভুক্ত একথা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে। আর ইমাম বুখারী রহ. টুপি যে নামাযের পোশাকেও সুন্নাত এটা বুঝানোর জন্য এ হাদীসটি নামাযের অধ্যায়ে এনেছেন। গোটা মুসলিম উম্মাহ এ হাদীস থেকে এ অর্থই বুঝেছে এবং সুন্নাত মনে করে টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়ে থাকে। অদ্যাবধি এমন কোন আলেমকে দেখা যায়নি, যিনি ইহরাম ছাড়া খালি মাথায় নামায পড়ছেন কিংবা পড়াচ্ছেন। সাধারণ মুসলমানগণও এ সুন্নাতের অন্তত নামাযের সময় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অবশ্য জাফরান ও কুসুম রঙের কাপড় ইহরাম ছাড়া অন্য সময়েও অপছন্দনীয়। এ সম্পর্কে ভিন্ন হাদীস রয়েছে। আর চপ্পল সংক্রান্ত অংশটি শুধু ইহরাম সংশ্লিষ্ট।

ইমাম বুখারী রহ. বিভিন্ন প্রসঙ্গে হাদীসটিকে আরো চার স্থানে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, সহীহ বুখারী; হাদীস নং ১৩৪, ১৮৪২, ৫৭৯৪, ৫৮০৬। কিন্তু প্রশ্ন হল, সহীহ বুখারীতে এত জায়গায় টুপির উল্লেখ থাকলেও আহলে হাদীসরা কেন টুপির হাদীস পেল না? তারা কোন বুখারী পড়ে? নাকি তারা সহীহ বুখারীর অন্য কোন হাদীসে খালি মাথায় নামায পড়ার ফযীলতের সন্ধান পেয়েছে? আমরা শুধু সহীহ বুখারী নয়, বরং অন্য যে কোন কিতাবের বরাতে এবং শুধু সহীহ নয়, বরং যে কোন মানের হাদীস পেলেও টুপি পরা ছেড়ে দিব, যে হাদীসের অর্থ হবে, 'খালি মাথায় নামায পড়া উত্তম কিংবা অধিক সওয়াবের কাজ অথবা টুপি মাথায় নামায পড়লে সওয়াব কম হবে কিংবা টুপি ইসলামী পোশাকের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

আর যদি এ জাতীয় কোন হাদীস না থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে দীনদার মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধভাবে অনুসৃত এ আমলকে পরিহার করবো। অথচ মুসলমানদের ঐকমত্যের আমলের বিরুদ্ধাচরণকারীকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে নিক্ষেপের ধমকি প্রদান করেছেন। দেখুন, সূরা নিসা; আয়াত নং ১১৫। **(চলবে ইনশাআল্লাহ)**

লেখক : নায়েবে মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

রাহমানিয়া লাইব্রেরী

৭৩ সাতমসজিদ সুপার মার্কেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রো: মুফতী সালাহুদ্দীন

এখানে সর্বপ্রকার কুরআন শরীফ, দরসী-গাইরে দরসী কিতাবাদি, শরাহ-শুরুহাত, বরেণ্য উলামায়ে কেরামের রচনাবলী, দীনী পত্র-পত্রিকা, আতর, টুপি, তাসবীহ, জায়নামায, সব ধরনের শিক্ষাসামগ্রী, তাবলীগ জামাআত ও মাদরাসা ছাত্রদের উপযোগী ফোল্ডিং বেড পাওয়া যায়।

বি.দ্র. এখানে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. লিখিত কিতাবসমূহ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

মোবাইল : ০১৬২৮-১০৫৫১১, ০১৮৪০-৯৯৪৮১৭, ০১৬১৬-৮৮২৪০৯

ভারতের একজন বিখ্যাত হিন্দু ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ

অনুবাদ : আবু মুহাম্মদ তাইম

ভারতের ভূপাল শহরে ১৯৮৬ সালে ভারতের একজন বিখ্যাত হিন্দু ব্যক্তি আচার্য মহন্ত ডক্টর স্বরূপজী মহারাজ ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলামী নাম ইসলামুল হক। তিনি তার স্ত্রী-কন্যাসহ ইসলামের নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেন। ডক্টর ইসলামুল হক একজন উচ্চশিক্ষিত, যোগ্যতাসম্পন্ন, মহৎপ্রাণ ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। তিনি তার অপার্থিব সম্পদ ইসলামকে নিয়েই পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণের পর তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পর্যালোচনামূলক অনুসন্ধান তার সামনে ইসলামের সত্যতা তুলে ধরে। ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে এই অভিযোগ দূর করতে তিনি বিশ্বের সামনে নিজেকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। এখানে তার একটি সাক্ষাৎকার প্রদত্ত হল, যা তার আধ্যাত্মিক জীবনের আমূল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সবিস্তার বিবরণ।

প্রশ্ন: *ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার পর আপনার অনুভূতি কী?*

উত্তর: আমার ওপর আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে তার অমূল্য সম্পদ ইসলামের সত্য বিশ্বাস দান করে সম্মানিত করেছেন। আমি মনে করি, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সফল ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন। যখন মিথ্যা বিশ্বাসের নিকষ আঁধারে আমি অন্ধের মতো পথ হাতড়াচ্ছিলাম তখন আমাকে 'ভগবান' মানা হতো। এখন এই নতুন আলোর জগতে আমি আমার ন্যায়সঙ্গত 'মানুষ' মর্যাদা লাভ করেছি।

প্রশ্ন: *আপনার পূর্বের নাম ও পেশা সম্পর্কে কিছু বলুন?*

উত্তর: আমার নাম ছিল মহন্ত ডক্টর শ্রী-শক্তি স্বরূপজী মহারাজ আদাসীন ধর্মাচার্য ঔদাই শক্তি। পৌরোহিত্য আমার পৈতৃক পেশা। এ সুবাদে আমি বেশকিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মথুরার বৃন্দাবনে অবস্থিত বনখণ্ড আশ্রম, বোম্বে আশ্রম এবং ভুবনেশ্বরে অবস্থিত পঞ্চাশ একর জায়গা জুড়ে নির্মাণাধীন (১৯৮৬ সালে) একটি পাতাল আশ্রম। শেষেরটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইনিস্টিটিউট। সেখানে আমার কাজ ছিল ধর্ম প্রচার, শিষ্যদের নাম তালিকাভুক্তি ও তাদের প্রশিক্ষণ দান।

প্রশ্ন: *আপনি একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত। দয়া করে আপনার শিক্ষা-দীক্ষা ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করবেন?*

উত্তর: আমি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছি হিন্দু আশ্রমে। তারপর ভারতের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচ্যবিদ্যার ওপর মাস্টার্স, গুরুকুল কাংরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (সংস্কৃতে) আচার্য ডিগ্রি এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মতত্ত্বের ওপর ডিপ্লোমা অর্জন করেছি। শেষেরটি ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। সে সঙ্গে এটি ছিল প্রাচ্যবিদ্যার ওপর পি. এইচ. ডি। এ হিসেবে ধর্মতত্ত্ব ও প্রাচ্যবিদ্যার ওপর আমার ডাবল ডক্টরেট ডিগ্রির কৃতিত্ব আছে।

একবার আমি পোপ ষষ্ঠ সেন্ট পলের আমন্ত্রণে ভ্যাটিকান সিটিতে গিয়েছিলাম। সেখানে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য আমাকে খুব চাপাচাপি করা হয়েছিল। সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত সেসব সুকঠিন আলোচনায় আমি এতোটাই ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম যে, আমার মেধা ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পোপ আমাকে সম্মানজনক উপাধি ও.এফ.এম.সি.এ.পি এবং ভ্যাটিকান সিটির নাগরিকত্ব প্রদান করে সম্মানিত করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম আমাকে মোটেই আকর্ষণ করেনি। ফলে আরও ভালো কিছুর খোঁজে আমি সেখান থেকে চলে আসি।

প্রশ্ন: *আপনি কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আপনার বংশ-পরিচয় কি?*

উত্তর: ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি ভারতের বৃন্দাবন শহরের মথুরা উপজেলায় আমার জন্ম। আমি বাবা নানক-এর ভেদি বংশের সন্তান।

প্রশ্ন: *আপনি কোন্ কোন্ ভাষা পড়তে এবং লিখতে পারেন?*

উত্তর: আমি বারোটি ভাষা জানি। ইংরেজি, সংস্কৃত, গ্রিক, হিব্রু, হিন্দি, প্রাকৃত, পালি, গুর্মুখি, মারাঠি, গুজরাটি, উর্দু ও আরবি।

প্রশ্ন: *আপনি হিন্দুধর্মের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বলুন তো হিন্দুরা কি মুসলমানদের নিয়ে আতঙ্কিত?*

উত্তর: ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের নিয়ে আতঙ্কিত নয়। তারা নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল ধর্মাদর্শের বিপরীতে ইসলামের পরিপূর্ণ ও মহিমান্বিত আদর্শ নিয়ে আতঙ্কিত। মানুষকে বর্ণ-গোত্র, জাত-পাত, উচ্চ-নীচ, দেশ-ভাষা, ধনী-নির্ধন এবং তথাকথিত মান-মর্যাদা নির্দেশক সকল পদ-পদবীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়ার মধ্যেই ইসলামের মাহাত্ম্য নিহিত। ইসলাম মানুষকে নিজস্ব, দৃঢ় ও স্থায়ী এক অস্তিত্ব দান করে। ইসলাম মানুষকে শুধুমাত্র এক ও একক স্রষ্টার সামনে মাথা নত করতে বলে; কোন সৃষ্ট বস্তু কিংবা একাধিকের সামনে নয়। কেউ ভয় পেলে ইসলামের সেই শক্তিটিকেই ভয় পায় যা মানুষকে এক স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে অন্য সকলের গোলামী ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। বস্তুত ইসলাম মানুষের গড়া সকল প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতা হতে মুক্ত।

প্রশ্ন: *আপনার মনে হয়, পৃথিবীর কোন দেশ থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে?*

উত্তর: ইসলাম চিরন্তন এবং মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা ইসলামকে ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন করতে পারে। তবে যে-সব মুসলমানের বিশ্বাস (ঈমান) ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল তাদের জীবন থেকে ইসলাম হারিয়ে যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত একজন মুসলমানের জীবনেও হিজরতের জযবা, বিজয়ের আবেগ, আত্মত্যাগের স্পৃহা ও ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত ইসলাম প্রসারিত হয়ে ঝঙ্কার তুলতে থাকবে।

প্রশ্ন: *ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কখনও ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন?*

উত্তর: পৃথিবীর প্রধান দশটি ধর্মকে আমি সেগুলোর মূল থেকে অধ্যয়ন করেছি। এ কারণে ইতোমধ্যেই ইসলামের ধর্মতত্ত্ব ও সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আমার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক বিশ্ববিখ্যাত গুরু এবং হিন্দু শঙ্কর আচার্য আছেন। যেমন: রমা গোপাল, মহানন্দ মহেশ্বর, স্বামী আখন্দ নন্দজী, গুরু গোয়ালকার বাবা সাহেব দেশমুখ,

ভিনোবা ভবে প্রমুখ। এঁরা সবাই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

১৯৮১ সালের প্রথমদিকে আচার্য ভিনোবা ভবে আমাকে তার পরমধাম আশ্রমে ভাষণ দেয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বড় বড় মহন্তদের মধ্যে ছিলেন দাদা ধর্মাধিকারী। হঠাৎ তিনি আমাকে একটি দুরভিসন্ধিমূলক প্রশ্ন করে বসেন। বলেন, স্বামীজী! আপনি তো বিশ্বের অনেক ধর্মই পড়েছেন, এগুলোর মধ্যে কোনটিকে মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো মনে করেন? আমি নির্দ্বিধায় বললাম, ইসলাম। তিনি বললেন, ইসলাম তো অত্যন্ত কঠিন ও সন্নিবদ্ধ ধর্ম। প্রতিউত্তরে আমি বললাম, যা কঠিন ও সন্নিবদ্ধ তা স্বাধীনতাও দেয়। পক্ষান্তরে যেটাকে সহজ ও স্বাধীন মনে করা হয় তা মানুষকে বারংবার দাসত্বের শৃঙ্খল পরায়। রিপুতাড়িত মানুষের জন্য এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন যার নির্দিষ্ট কঠোরতা ও সন্নিবদ্ধতা রয়েছে; যা মানুষের পার্থিব জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখে কিন্তু পরকালে দেয় মহামুক্তি। আমার দৃষ্টিতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা শ্রেষ্ঠ হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

প্রশ্ন: *এটা অত্যন্ত সাহসিকতার ব্যাপার যে, আপনি নিজ ধর্ম ভিন্ন অন্য একটি ধর্মের প্রতি আপনার উপলব্ধি অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে আপনার হৃদয়ে ইসলামের যে মহানুভবতা উপলব্ধি করেছেন তার সাক্ষ্য দেয়। মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা এবং তাদের উপর আপতিত কষ্টক্লেশ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও যে ব্যাপারটি আপনাকে ইসলাম গ্রহণে তাড়া করেছিল এখন দয়া করে সেই অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনাটি বলুন। বিশেষত আজ যখন সবখানে মানুষ হিন্দুবিপ্লবের কথা বলছে, তখন এই কন্টকাকীর্ণ পথে পরিভ্রমণের মনোবল আপনি কোথায় পেলেন?*

উত্তর: এটা ছিল বহু বছরের তৃষ্ণা ও অনুসন্ধানের ফলাফল যা অবশেষে একটি মহান ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। জানুয়ারী, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ। একরাতে স্বপ্নে দেখি, কিছু উশৃঙ্খল জনতা আমাকে তাড়া করছে। আমি দৌড়ালে তারাও দৌড়ায়, থামলে তারাও থেমে যায়। হঠাৎ কিছুতে হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে যাই। ঠিক সেই মুহূর্তে দুটি অপরিচিত হাত আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। উঠে দাঁড়াতেই একটি জ্যোতির্ময় চেহারার ওপর আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারলাম না। পাশে দাঁড়ানো কেউ আমাকে বলে দিল, ইনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। পবিত্র সেই সত্তা আমাকে ইসলামের কালিমা পড়তে বললেন। তিনি আমার হাত ধরে কালিমা উচ্চারণ করলেন এবং কালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে অনুসরণ করে চললাম। (কালিমা পাঠ করলাম।) তারপর তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন এবং এদেশের মানুষকে কালিমা শিক্ষা দেয়ার আদেশ করলেন। জানি না এই অপার্থিব স্বপ্ন কতক্ষণ স্থায়ী ছিল। যখন আত্মস্থ হলাম, দেখি রাত তিনটা বাজছে। আমার স্ত্রীও একই রাতে একই সময়ে একটি অনুপ্রেরণামূলক স্বপ্ন দেখেন। এমন আনন্দদায়ক সাযুজ্য ও দুর্লভ সাদৃশ্যে আমরা পরম আনন্দে শিহরিত হই। হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে সুমধুর তান। মনে হচ্ছিল আমরা প্রথম শতাব্দীর মুসলমান। আমরা যত দ্রুত সম্ভব পৃথিবীতে সত্যের দ্যুতি ফিরিয়ে আনার দুর্নিবার তাড়া অনুভব করি। এই মনোরম স্বপ্ন আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে, আমাদের জীবনে একটা বড় ধরণের পরিবর্তন ও বিপ্লব অত্যাসন্ন। সেদিন থেকেই আমরা পরিকল্পনা করছিলাম, কীভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে ইসলামের কালিমা পাঠ করা যায়। আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং গোপনে নামায ও ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান পালন করতে থাকি। আলেমদের শহর ভূপালে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। ১৯৮৬ সালের ১০ই মে পবিত্র রমাযানের চাঁদরাতে আমি, আমার স্ত্রী ও কন্যা স্রষ্টার নিরাপদ আশ্রয় মহান ধর্ম ইসলামে প্রবেশ করি। অন্য কথায়, আমরা আমাদের নিজস্ব জগতে ফিরে আসি যা আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। তেপান্তরে বহুদিন লক্ষ্যহীন ঘোরাফেরার পর এখন আমরা শান্তিতে শ্বাস নিতে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি।

প্রশ্ন: *অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ হতে ঢালাওভাবে অভিযোগ করা হয় যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে–এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?*

উত্তর: আমি নিজেই এ অভিযোগের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট ও কড়া জবাব। তাছাড়া এই অভিযোগ শুধু সাধারণ হিন্দুদের নয়; অনেক শিক্ষিত হিন্দুও এখন পর্যন্ত এই অবাস্তব ধারণায় আটকে আছেন।

প্রশ্ন: *আপনি ইসলামের পাশাপাশি আরও কিছু ধর্ম অধ্যয়ন করেছেন। সেগুলোর মধ্যে কি আল্লাহ তা'আলা, পবিত্র কুরআন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের কোন সূত্র পেয়েছেন?*

উত্তর: বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ছাড়া সকল ধর্মীয় সাহিত্যে আল্লাহ, মুহাম্মদ অথবা আহমদ নাম আছে। বেদ গ্রন্থে এই নামগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার। 'অল্লা' শব্দটি ঋগবেদ-এর ৯ম মণ্ডল ৬৭ সুক্ত ৩০ মন্ত্রে আছে যা চারটি বেদ-এর অন্যতম। অনুরূপভাবে 'মামহ'/'মহামদ' এবং 'অহমিদ্ধি' শব্দগুলো নবী মুহাম্মাদ এবং আহমাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ঋগবেদে পবিত্র কুরআনের জন্য 'কোর-ধানো' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন: *আপনি অঢেল সম্পদ এবং বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে ইসলামের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশ করেছেন–এখন আপনার জীবিকার প্রধান উৎস কী?*

উত্তর: যদি সারা দুনিয়ার রাজত্বও আমার অধীন হতো ইসলামের জন্য আমি তা নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করতাম। সপ্তপৃথিবীর শ্রেষ্ঠধনীর মর্যাদাও আমাকে সে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দিতে পারতো না যা আমি ইসলামের মধ্যে পেয়েছি। আমি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমি সম্মানজনকভাবে এবং স্বচ্ছন্দে আয় বুঝে ব্যয় করতে সক্ষম।

প্রশ্ন: *ইসলামের একজন সৈনিক হিসেবে আপনি সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছাতে চান?*

উত্তর: এ প্রশ্নের জবাবে আমি খ্রিস্টান ধর্মের একটি উপদেশগল্প উল্লেখ করতে চাই। 'রাতের প্রার্থনা শেষে সকালবেলা যিশুখ্রিস্ট নদীর অপর তীরে অপেক্ষমান ভক্তদের কাছে পৌছার জন্য পানির উপর দিয়ে হাঁটছিলেন। শিষ্যরা এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল এবং বিপুল বিস্ময়ে যিশুকে শুধাল–তারাও যদি তাঁর মতো পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারতো! যিশু বললেন, অবশ্যই পারবে, যদি তোমরা তোমাদের চোখ আমার ওপর নিবদ্ধ রাখো। মনে রেখো, আমার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ সরিয়ে নিলে তোমরা ডুবে যাবে। শিষ্যরা যিশুর ওপর চোখ রেখে তার সঙ্গে পানির উপর দিয়ে হাঁটছিল। এভাবে কিছুদূর চলার পর তাদের সন্দেহ হতে শুরু

করল–আসলেই তারা পানির উপর দিয়ে হাঁটছে কিনা। এই ভেবে তারা নিচের দিকে চোখ নামাতে না নামাতেই ডুবে গেল এবং মারা গেল।'

মুসলিমবিশ্বের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, এই ভব-দরিয়া পার হয়ে অপর প্রান্তে নিরাপদে পৌঁছার জন্য তাদের উচিত, মহান নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধানের ওপর সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টায় তা পালন করা। আমরা যদি এর থেকে সামান্যও বিচ্যুত হই, আমাদের ডুবে যাওয়া অনিবার্য– তখন আর পরিত্রাণের উপায় থাকবে না। নিজেদেরকে সংশোধন করে সঠিক লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সময় মুসলমানদের এখনও ফুরিয়ে যায়নি। এটা করতে পারলে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের শীর্ষে অবস্থান করবে।

প্রশ্ন: *আপনার মতে একজন মুসলমানের মধ্যে কি কি গুণ থাকা উচিৎ, অর্থাৎ আপনি একজন মুসলমানকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেন?*

উত্তর: আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে ভালোভাবে একজন মুসলমানকে কে সংজ্ঞায়িত করতে পারে? তিনি বলেছেন, 'মুমিনের দৃষ্টান্ত মৌমাছির ন্যায়–যে পবিত্র বস্তু (পুষ্পরেণু) আহার করে এবং পবিত্র বস্তু (মধু) পরিত্যাগ করে। আর (এ উদ্দেশ্যে) যখন সে (ফুল বা ফলের ওপর) বসে, কোন কিছু ভাঙে না এবং বিনষ্ট করে না।'(মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং ৬৮৭২; সহীহ) অর্থাৎ বিষ সংগ্রহের লক্ষ্যে নয়; মৌমাছি শুধু মধু প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পুষ্পরেণু শোষণ করে। এবং এটা তার নিজের প্রয়োজনে নয়, অন্যের উপকার সাধনের নিমিত্তে। মানুষ, পাখিসহ প্রায় সকল প্রাণী তার কীর্তিতে উপকৃত হয়। আর এ কাজে কারও ক্ষতিসাধন না করে মৌমাছি তার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। অপর এক হাদীসে প্রিয় নবী আরও বলেছেন, 'মুসলিম হল সে যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৯)

প্রশ্ন: *প্রথম শতকের ইসলাম পুনরুদ্ধারে আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন?*

উত্তর: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো প্রশ্ন। প্রথম শতকের ইসলামকে পুনর্জীবন-দানের স্পৃহা বহু উজ্জীবিত তরুণের হৃদয়ে বিদ্যমান। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ওই শতকের ইসলাম খুব একটা দূরে নয়। আসল ব্যাপার হল, মুসলমানগণ এই শতকটাকে বহু শতাব্দী ধরে তাদের হৃদয়ে বীজের মতো লালন করে আসছে। ইসলামের প্রথম শতকের পুনরুদ্ধারের জন্য ইসলামের সৈনিকদের নতুন করে অঙ্গীকার করতে হবে, আনুগত্যের শপথ নিতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে খাঁটি বিশ্বাস, মহৎ আকাঙ্ক্ষা এবং বেলালী-ধৈর্য নিয়ে কাজ করতে হবে। নতুন আত্মত্যাগ এবং আনুগত্যের সঙ্গে তাদেরকে আল্লাহ ও তার নবীর নির্দেশিত পথে জীবন গড়তে হবে। যখন একজন মুসলমান উল্লিখিত সচেতনতা ও সতর্কতার সঙ্গে তার জীবন পরিচালনা করবে তখন তার মধ্যে সত্যিকার ঈমানদারের গুণাবলী বিকশিত হবে। এটা ধীরে ধীরে গোটা পরিবেশকে সদগুণ ও ধার্মিকতা দ্বারা পরিপূর্ণ করতে থাকবে। এ উদ্দেশ্যে আমি 'মুমিন তৈরি' আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনা করছি। এ আন্দোলন ঈমানদারদের জীবনব্যবস্থার গভীর থেকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক রোগ নির্ণয়, তার প্রতিকার এবং বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজকে একটি সুস্থ ও সমন্বিত দেহে পরিণত করার লক্ষ্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আপাতত আমি তিন দফা কর্মসূচি শুরু করেছি– এক. ইসলামের নিরাপত্তাবিধান এবং সংরক্ষণ। দুই. রাষ্ট্রীয় আইন ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সীমার মধ্যে থেকে সাধ্যানুযায়ী মুসলমানদের সমর্থন দান ও তাদের উন্নয়ন। তিন. সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ভাষায় আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা সহায় হোন।

[imamreza.net/eng/imamreza.php?id=5936 থেকে সংগৃহিত]

অনুবাদক : শিক্ষার্থী, ৩য় বর্ষ, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

বিলম্বিত বোধোদয়ের পরিণাম

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম

সৃষ্টির সেরা মানুষ সৃজিত হয়েছে মহান আল্লাহর আনুগত্যের লক্ষ্যে। এই উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে মানুষের মাঝে তৈরি হয় একটা আকুলতা। কখনও সেই আকুলতা পল্লবিত হয়। আনুগত্যের আকুলতা, ইবাদতের ব্যাকুলতা তাকে দান করে এক মহাসুখের প্রাণময় উপলব্ধি। সেই উপলব্ধির মাত্রা ব্যক্তি ছাড়িয়ে অন্যের মাঝে বোধোদয় হয়ে মূর্তিমান হয়, শারীরিক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে একটা পর্যায়ে এসে ব্যক্তির কাছে বোধের আবহ সক্রিয় হতে থাকে। অন্যের নজরেও প্রকট হয়ে ধরা দেয় এই আকুলতা। ব্যাকুল হয়ে নিজের আকুলতা সংক্রমিত করতে চায় অন্যের মাঝে। অন্যেরা তার আকুলতা গ্রহণ করে সানন্দে। আবার কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে অগ্রাহ্য করে, কখনও তাতে আনন্দের একটা উপস্থিতিও অনুভূত হয় তার। এই গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্যের দোলাচলে দুলতে থাকে বনি আদম। জীবনকালের শেষবিকেলে ফ্যাকাসে অনুভূতি নিয়ে দোল খায় জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত। থেকে থেকে শক্ত হতে থাকে সেই অনুভূতি। হাজারো কল্পনার রঙিন ফানুস উড়ে হাওয়ায় পরিণত হয়ে যখন বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে সামনে আসতে শুরু করে তখন হিসাব কষতে থাকে, কী পেলাম আর কী হারালাম!

প্রিয় পাঠক! ধরতে গেলে সবার জীবনে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরকার হয় সময়ে সময়ে। কথায় বলে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। সময় মতো একটা কাজ করে রাখলে দুঃসময়ে তা বহু দরকারে আসে। সময় মতো একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলে দুর্দিনে তা সমূহ প্রয়োজনেও আসে, আবার হাজারো দুঃখও লাঘব করতে পারে। কিন্তু সময় থাকতে, জীবন ও আয়ুষ্কাল থাকতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে না পারলে, সময়ের সেরা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে দুর্বিষহ জীবনের এক করুণ অধ্যায় অপেক্ষা করতে থাকে অনিবার্যভাবে। এই কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে। এসব বর্ণনা দিয়েছেন ঐ সত্তা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মহাকালের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। যাঁর কুদরতের আয়ত্তে সবকিছুই আবর্তনশীল। মহাকালের জীবন-কাল একদিন ফুরিয়ে যাবে। বিশ্বের সবকিছুই একদিন শেষ হয়ে যাবে। ইহলৌকিক এই সাজানো সংসার একদিন তছনছ হয়ে নতুন করে তৈরি হবে পারলৌকিক অনন্ত জীবন। অনন্ত জীবনে মহান সুখের মহাসফলতা পেতে সময় মতো সিদ্ধান্ত নিতে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে পস্তাতে হবে অনন্তকাল। এই মহাসত্য যে ব্যক্তি বেশি উপলব্ধি করতে পারবে, যার বোধোদয় যত দ্রুত হবে ততই কল্যাণের হাতছানি তাকে ঘিরে আবর্তিত হবে।

প্রকৃত সফলতা কি?

ভূমিকা ছাড়াই যদি বলা হয় আসল সফলতা কি? তাহলে বলতে হয় আসল সফলতা হলো মুমিন-মুসলমান হয়ে মুমিনের মতো জীবন যাপন করা। সাদামাটা ও সহজ-সরল কথায় বলতে গেলে মৌলভি সাহেবের মতো ধর্মকর্ম করা। ঈমান-আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকা। দৈনন্দিন ও প্রাত্যহিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে, পেশাদার জীবনের কর্মক্ষেত্রে থেকেই ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি যথাযথ বিশ্বাস ও ঈমান নিয়ে গভীর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে মনেপ্রাণে আমলে ডুবে থাকা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ.

নিশ্চয় যাঁরা ঈমান এনে নেক কাজ করেছে তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই বিরাট সাফল্য' (সূরা বুরূজ- ১১)

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। এরূপ লোক সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটা মহা সাফল্য। (সূরা নিসা- ১৩)

কারা প্রকৃত সফল?

ব্যক্তি জীবনে অনেকে সফলতা পেতে মুখিয়ে থাকে। কেউ সফলতা পেয়ে নিজেকে সফল মনে করে। আবার অনেকে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। সফলতার কোনো মাপকাঠি মনুষ্যসমাজে নেই। তবে মানুষ সাধারণত পার্থিব ধন-সম্পদ আর বিত্ত-বৈভবের প্রাচুর্যকে সফলতার পূর্বশর্ত মনে করে থাকে। কেউ সামান্য পেয়েও আত্মতুষ্ট ও পরিতুষ্ট। আবার কেউ অনেক বিষয়-আশয়ের মালিক হয়েও নিজের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করে। ব্যক্তি জীবনে সফলতার মাত্রা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বাল্যকালে সামান্য কিছুতে সফলতার হাসি ফোটে শিশুর মুখে। বয়স বাড়ার সাথে সফলতার মাত্রাও যেন পরিপক্কতা লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সফলতা আর তৃপ্তির হাসি ফোটাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অবশেষে বাড়ি-গাড়ি আর ধনৈশ্বর্যে গা ভাসিয়ে চলতে থাকে মানব-জীবন। এক সময় দুয়ারে কড়া নাড়ে পরকালের সফর। তখন সফলতার অনেক কিছুই তার কাছে অনর্থক জীবনের রঙিন ফানুস মনে হয়। তার মনে একরাশ প্রশ্ন সফলতার প্রকৃত মানদণ্ডকে ঘিরে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে দোলায়িত সফলতা আসলে তো সাফল্য নয়। তখন একটা অতৃপ্তির অব্যক্ত বেদনা তাকে গ্রাস করে। এভাবে শূন্য ও রিক্ত হাতে চলে যায় মহাসফল (!) এক স্বত্তা। পরলোকে পাড়ি জমায় অসহায় ব্যর্থ এক জীবন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সফল ব্যক্তিদের কথা আলোচিত হয়েছে। নিম্নে তার সামান্য বিবরণ দেয়া হচ্ছে। ইরশাদ হয়েছে,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ : এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হেদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং তারা আখেরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী। (সূরা বাকারা- ২-৫)

সূরা আলে ইমরানে আছে,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দিবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী। (সূরা আলে ইমরান- ১০৪)

সূরা আ'রাফে আছে,

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ : এবং সেদিন (আমল সমূহের) ওজন (করার বিষয়টি) একটি অকাট্য সত্য। সুরতাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য। (সূরা আ'রাফ- ৮)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

সুতরাং যারা তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তার সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম। (সূরা আ'রাফ- ১৫৭)

সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে,

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ : কিন্তু রাসূল এবং যে সকল লোক তার সঙ্গে ঈমান এনেছে তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং তারাই কৃতকার্য। (সূরা তাওবা- ৮৮)

সূরা মুজাদালায় ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ : যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিবসে ঈমান রাখে, তাদেরকে তুমি এমন পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখছে- হোক না তারা তাদের পিতা বা পুত্র বা তাদের ভাই কিংবা তাদের স্বগোত্রীয়। তারাই এমন, আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমানকে খোদাই করে দিয়েছেন এবং নিজ রূহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর দল। স্মরণ রাখো, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়। (সূরা মুজাদালা- ২২)

বুদ্ধিমান কে?

ব্যক্তি জীবনে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় কে বুদ্ধিমান আর কে নির্বোধ ও বোকা। বুদ্ধি ও বোকামির একটা আবহ অবস্থান করে সামাজিক জীবনে। মানুষের মাঝে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে নিজেকে বুদ্ধিমান হিসেবে জাহির করা এবং বোকামির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটা প্রাণান্ত প্রবণতা। নিজের বুদ্ধিমত্তার গুণে অনেক কল্যাণ লাভ করা যায়, উপকারিতা পাওয়া যায়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে বাহবাও কুড়ানো যায়। পক্ষান্তরে বোকামির কারণে অনেককে কষ্ট ও ভোগান্তি পোহাতে হয়, নিজের ক্ষতির পাশাপাশি অন্যও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনাও থাকে। এ থেকে সমাজে 'আক্কেল সেলামি' বা বোকামির দণ্ড বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। যা হোক সমাজের এই বুদ্ধি ও বোকামির মানদণ্ড স্রেফ মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক। মানুষের সমাজ-জীবনে যা বুদ্ধিমত্তা হিসেবে প্রচলিত, সেটাই বুদ্ধিমত্তা হিসেবে বিবেচিত। আবার যা বোকামির বিষয় হিসেবে বিবেচিত সেটাও মানব-কল্পনা প্রসূত। মানুষের এই মানদণ্ড অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার একটা ব্যাখ্যা আসমানী বার্তা তথা ওহীর জ্ঞানের আলোকে দেয়া হয়েছে। নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন,

عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله قال هذا حديث حسن.

অর্থ : বুদ্ধিমান যে নিজেকে দ্বীনের অনুগত করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী (সময়ের জন্য) আমল করে। (বোকামিজনিত) অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুগত করে এবং আলাহ্‌র (কাছে ক্ষমা ও মাগফিরাতের) আশায় বুক বেঁধে থাকে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৪৫৯)

এখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ধর্মকর্ম করে, নিজের জীবন ও অবস্থানে দীনদার হতে চায় তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। অথচ সমাজে দ্বীনদার শ্রেণীর মানুষকে অনেকে বুদ্ধিমান মনে করে না। বিশেষ করে উলামায়ে কেরামকে অনেকে তেমন একটা বুদ্ধিমান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। আবার অনেকে ধর্মকর্ম ও ইসলামের বিধি-বিধানকে নিজের আভিজাত্যের পরিপন্থী মনে করে। মানসিক বৈকল্যজনিত দুর্বলতা থেকে অনেকে তথাকথিত কৌলিন্য রক্ষার খাতিরে এমনকি নিজের প্রকৃত পরিচয় মুসলিম হিসেবে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে। কখনও বুদ্ধিমত্তা জাহির করতে গিয়ে নিজের নাম লিখায় বুদ্ধিজীবী তালিকায়। তখন নিজেকে নিরেট ধর্মদ্রোহী হিসেবে প্রকাশ করতে পারা চরম সৌভাগ্য মনে করে অনেকে। মানবিক অপরিপক্কতা থেকে উদ্ভূত এই মানসিক রোগ-ব্যাধির জীবাণু নিয়ে অতিক্রম করে জীবন-তরী। পরিতাপের বিষয় হলো, আত্মবিস্মৃতি থেকে সৃষ্ট এসব পরিস্থিতির মূল কারণ হলো শিক্ষাব্যবস্থা। যা মুসলিম দেশগুলোতে অমুসলিমগণ কৌশলে মুসলিমদের জীবন-নাশক সিলেবাসের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। যার বিষবৃক্ষ আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। যা থেকে বাঁচার বাহ্যিক কোনো সুড়ঙ্গপথ দেখা যাচ্ছে না।

শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মুসলমানদের বিলম্বিত বোধোদয়

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও দেখা যায়, যারা যত বেশি আধুনিক শিক্ষিত, যাদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে দেশ-বিদেশে সুনাম-সুখ্যাতি রয়েছে, পারলৌকিক চিন্তা তাদের অনেক কম। দুনিয়ার জীবন নিয়ে তাদের ব্যস্ততা মাত্রা ছাড়িয়ে থাকে। দেশ, জাতি ও বিশ্ববাসী নিয়ে তাদের যত চিন্তা। নিজের আমল ও পরকালের মুক্তি নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর সময় হয়ে ওঠে না, খুঁজে পায় না বাড়তি একটু সময় নিজেকে নিয়ে ভাবার। পরকালের মুক্তির পয়গাম মনে হয় তাদের কর্ণকুহরে কোনোভাবেই পৌঁছতেই পারছে না। কখনও এভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শীর্ষ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। আবার কখনও দেশের প্রধান ব্যক্তিতে রূপান্তর হয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকে জীবন। অবশেষে পড়ন্ত বিকেলে একদিন ডাক আসে পরলোকে চলে যাওয়ার। হাজারো গণমাধ্যমে তাদের সেই চলে যাওয়ার কথা প্রচারিত হতে থাকে। সফলতার নানা কথা থাকে মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষের ভাগ্যে জোটে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করার সুযোগ।

বিলম্বিত বোধোদয়ের কারণে অন্তহীন আফসোস

অনেকে অনেক কিছু বুঝতে পারে, তবে সেই বুঝ ও উপলব্ধি হয় বিলম্বে। ততক্ষণে জীবনের খেলাঘরে হাতের পাশা ছোঁড়া হয়ে গেছে। ওহী ও

আসমানী বার্তার আগাম দুঃসংবাদ হল বিলম্বিত এই বোধোদয়ের কারণে পরকালে তাদের আফসোসের কোনো সীমা থাকবে না। মহাপবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে তাদের আফসোসজনিত করুণ আর্তনাদের চিত্র ফুটে উঠেছে। তারা মনস্তাপে ক্লিষ্ট হবে। রাজ্যের অনুতাপ-অনুশোচনা তাদের ঘিরে ধরবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا.

অর্থ : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন। তাতে তারা সর্বদা এভাবে থাকবে যে, তারা কোনো অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও না। যেদিন আগুনে তাদের চেহারা ওলট-পালট হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের কথা মানতাম! এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি লানত করুন, যা হবে অতি বড় লানত। (সূরা আহযাব- ৬৪-৬৮)

সূরা ফুরকানে ইরশাদ হয়েছে,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا.

অর্থ : এবং যেদিন জালিম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে একই পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে তো উপদেশ গিয়েছিল, কিন্তু সে (ঐ বন্ধু) আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর শয়তান তো এমনই চরিত্রের যে, আপদকালে সে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়। (সূরা ফুরকান- ২৭-২৯)

সূরা যুখরুফে আছে,

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ হয়ে যায়, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সঙ্গী হয়ে যায়। এরূপ শয়তানেরা তাদেরকে সৎ পথ থেকে বিরত রাখে আর তারা মনে করে আমরা সঠিক পথেই আছি। পরিশেষে এরূপ ব্যক্তি যখন আমার কাছে আসবে তখন (সে তার সঙ্গী শয়তানকে) বলবে, আহা! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো। কেননা তুমি বড় মন্দ সঙ্গী ছিলে। (তাদের বলা হবে,) আজ একথা কিছুতেই তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে। তোমরা শাস্তিতে একে অন্যের অংশীদার। (সূরা যুখরুফ- ৩৬-৩৯)

সূরা মুমিনুনে ইরশাদ হয়েছে,

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ.

অর্থ : তখন যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের জন্য লোকসানের ব্যবসা করেছিল। তারা সদা-সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের চেহারা ঝলসে দিবে এবং তাতে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হতো না? যা তোমরা অস্বীকার করতে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম বিপথগামী। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করুন। অতঃপর পুনরায় যদি আমরা সেই কাজই করি, তবে অবশ্যই আমরা জালিম হবো। আল্লাহ বলবেন, এরই মধ্যে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলবে না। (সূরা মুমিনূন- ১০২-১০৮)

বোধোদয়ের সময় কি এখনও হয়নি?

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে পরকালের চূড়ান্ত সফলতা পেতে, কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে মহাআয়োজন করেছেন স্রেফ নিজের দয়ার গুণে। এই আয়োজনে বান্দাকে যোগাতে হয়নি এতটুকু পাথেয়। পবিত্র কুরআন মানুষের বোধোদয় জাগাতে কোন মাত্রায় আকুতি জানিয়েছে, তা এই আয়াত থেকে বোধগম্য করা একদম সহজ। ইরশাদ হয়েছে,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? এবং তারা তাদের মতো হবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল এতঃপর যখন তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলো, তখন তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল এবং (আজ) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। (সূরা হাদীদ- ১৬)

একটু সময় : দুঃসময়ের তীব্র আকুতি

মানুষ যখন দুঃসময়ের আবর্তে পড়ে বাঁচার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করবে, তখন তারা তাদের মিনতি জানাতে থাকবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ইরশাদ হয়েছে,

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ.

অর্থ : এবং (হে নবী!) তুমি মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক করো, যে দিন তাদের উপর আযাব আপতিত হবে আর জালিমগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অল্পকালের জন্য সুযোগ দিন, তাহলে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিবো এবং রাসূলগণের অনুসরণ করবো। (সূরা ইবরাহীম- ৪৪)

বোধোদয়ের জন্য গোটা জীবনে একটু সময় কি পাওয়া যায়নি?

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.

অর্থ : আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ আয়ু দেইনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন মজা ভোগ করো। কেননা এমন জালেমদের সাহায্যকারী হওয়ার কেউ নেই। (সূরা ফাতির- ৩৭)

মহাকালের শেষ পরিণতি

অবিশ্বসী মানুষ মনে করে কাল নিরবধি। মহাকালের এই অনিঃশেষ যাত্রায় আমরা

চলছি এক অজানা গন্তব্যের পানে। কোনোদিন এই যাত্রা শেষ হবে কিনা কে জানে। বস্তুত মহাকালের মহাযাত্রা একদিন শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে। দেখা যাবে অন্য আয়োজন। ছোট-বড় সব কিছুর হিসাব দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.

অর্থ : বলে দাও, তোমাদের জন্য এমন এক দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত পিছাতে পারবে না এবং সামনেও যেতে পারবে না। (সূরা সাবা- ৩০)

সূরা কাহাফে ইরশাদ হয়েছে,

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.

অর্থ : আর 'আমলনামা' সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, তাতে যা লেখা আছে, তার কারণে তারা আতঙ্কিত এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ! এটা কেমন কিতাব, যা আমাদের ছোট-বড় যত কর্ম আছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে রেখেছে, তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি কোনো জুলুম করবেন না। (সূরা কাহাফ- ৪৯)

যথাসময়ে বোধোদয়ের সুখানুভূতি

অনেক মানুষ এমন আছে, যারা জীবনে যথাসময়ে সঠিক জিনিস ধরতে পেরেছিলো। তারা পরকালে বিশাল সুখানুভূতি অনুভব করবে। পবিত্র কুরআনে এমন একটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.

অর্থ : তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞেস করবে। তাদের একজন বলবে, আমার ছিলো এক সঙ্গী। সে বলতো, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। বলবে, আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো হাজিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। (সূরা সাফফাত- ৫০-৫৭)

একদিন সবারই বোধোদয় হবে

হাশরের মাঠে কাফেররাও আল্লাহ্র প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। পবিত্র কুরআনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا.

অর্থ : যে দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিলে। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৫২)

তাই যথাসময়ে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সবার বোধোদয় দান করেন, এই কামনা হোক মনেপ্রাণে। আমীন।

লেখক : মুহাদ্দিস, জামিয়া মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া, টিএন্ডটি কলোনি মাদ্‌রাসা, বনানী, ঢাকা
ও মুদাররিস, আল জামিআতুল ইসলামিয়া জান্নাতুল আতফাল, শ্রীপুর, গাজীপুর
গ্রন্থকার : আরবী বাগ্‌ধারা
arabicidiom12@gamil.com

মা'হাদু উলূমিল কুরআন ঢাকা

আততাখাস্‌সুস ফী উলূমিল কুরআন

* ভর্তি কার্যক্রম শুরু: ৬ ই শাওয়াল; ১৪৩৭ হিজরী।
* ১০ জনের কোটা পূরণ সাপেক্ষে ১০ শাওয়াল পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম চলবে ইনশাআল্লাহ।
* ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সহ বিস্তারিত তথ্য জানতে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বয়স্ক হিফজুল কুরআন বিভাগ

গাইরে হাফেজ নবীন আলেমদের জন্য মা'হাদের বিশেষ উদ্যোগ বয়স্ক হিফজুল কুরআন বিভাগ।

* রমজান ১৪৩৬ হিজরী থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
* ১৩ শা'বান হতে ২০ শা'বান পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম চলবে ইনশাআল্লাহ।
* যারা হিফজ করেনি বা আংশিক হিফজ করেছে অথবা হিফজের ইয়াদ মজবূত করতে আগ্রহী তারা এ বিভাগে ভর্তি হতে পারবে।

যোগাযোগঃ শিক্ষা দফতর, মা'হাদু উলূমিল কুরআন
মোবাইল:০১৭৫৬৯৫২৪৯৪, ০১৯১৪৬৯২৬০২

আরবী সাহিত্যের প্রবাদ-পুরুষ

মাওলানা শহীদুল্লাহ ফযলুল বারী রহ.-এর ইন্তিকাল

শরীফ আহমদ

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে আরবী ভাষা চিন্তা ও চর্চায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কওমী অঙ্গনের আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ, একাধারে আরবী, উর্দু, ইংরেজী এবং বাংলায় ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ ফযলুল বারী সাহেব গত ১৪/০৪/২০১৬ইং বৃহস্পতিবার বাদ ফজর নয়াপল্টনস্থ নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে অনুবাদকের পেশা গ্রহণ এবং আরবে দীর্ঘ প্রবাস যাপন তার আরবী ভাষা চর্চার একটি বিশাল ক্ষেত্র তৈরী করে দেয়। এতে করে ব্যক্তিগত চর্চায় তিনি আরবী সাহিত্যের 'হীরক খণ্ডে' পরিণত হন। এতকিছু সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তার প্রথম এবং প্রধান দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম করাচী (পাকিস্তান) এবং জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ (ঢাকা)-এর আদর্শের পূর্ণ লালনকারী। দীর্ঘকাল দরস-তাদরীসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা না থাকা সত্ত্বেও নীতি ও আদর্শের দিক থেকে তার যে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি, তা জ্ঞানীমহল মাত্রই অবগত। তার প্রতি দেশের শ্রদ্ধাভাজন ও বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের অগাধ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাই এর প্রমাণ। উলামায়ে কেরামের এই ভালোবাসাই তাকে সৌদি দূতাবাসে নিয়মিত পেশাগত জীবন যাপনের পাশাপাশি একাধারে জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, জামি'আ মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, জামি'আ ইসলামিয়া আকবর কমপ্লেক্স, আল-মারকাযুল ইসলামীসহ ঢাকার বিভিন্ন মাদরাসার আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেছে।

কর্মমুখর জীবনের শেষদিকে ১৪৩৬/৩৭ হিজরী শিক্ষবর্ষে তাঁরই দিক-নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধানে তাঁরই বিশিষ্ট শিষ্য, দীর্ঘদিনের সহকারী মাওলানা আনওয়ারুল আজীম সাহেবের প্রচেষ্টায় নতুনভাবে গড়ে উঠেছে مركز زيد بن ثابت رض للتدريب اللغوي মারকায যায়দ বিন সাবিত রাযি. ভাষাপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যেখানে তিনি সপ্তাহে চার দিন নিয়মিত দরস প্রদান করতেন।

তাঁর অনন্যসাধারণ দরসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি অবিরত প্রশ্ন ও চর্চার মধ্যে থাকতেন। যারা তাঁর কাছে পড়েছেন, তারা জানেন, শহীদুল্লাহ ফযলুল বারী সাহেবের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তিনি ছাত্রদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অজানা বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারতেন এবং পুরোনো চিন্তার মূল্যায়ন ও বর্তমান অবস্থান নির্ণয়ে সরাসরি তত্ত্ব না দিয়ে প্রায়োগিকভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে পরিবর্তন ও গ্রহণের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারতেন।

সাহিত্যের অলঙ্কারে আরবী ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদানে আত্মনিবেদিত হওয়া যদিও জীবনের পড়ন্ত বেলায় ছিল, তবুও একজন জীবন্ত মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বিশেষত বাংলাদেশে ব্যবহারিক আরবী ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদপুরুষ! আরবী সাহিত্যাঙ্গনের পরবর্তী প্রজন্ম তার এ ঋণ কখনোই হয়তো শোধ করতে পারবে না...!

এখানে অতি সংক্ষেপে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের সামান্য অংশ তুলে ধরা হল:

১৯৫৪ সালে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানাধীন 'গোবিন্দল' গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত দীনী পরিবারে মাওলানা ফযলুল বারী রহ.-এর ঔরসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের হাফিযিয়া মাদরাসাতেই পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়। এরপর মাত্র সাত বছর বয়সে হযরতের আব্বাজান তাকে সুদূর মুন্সিগঞ্জের মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসায় ভর্তি করে দেন।

সেখানে কিছুদিন থাকার পর ১৯৬২ সালে পুনরায় ভর্তি করানো হয় ঢাকার বংশাল হাফিযিয়া মাদরাসায়। সেখানে হাফেয আব্দুল হক সাহেবের নিকট ১৯৬৫ সালে হিফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৬৬ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে তার পিতা তাকে গ্রামের এক আলেমের তত্ত্বাবধানে করাচী পাঠান। তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দর থেকে হাফ টিকিটে একশত ত্রিশ টাকা প্লেনে করে করাচী গমন করেন। করাচী পৌঁছে সেখানে জামি'আ দারুল উলূম করাচীতে ভর্তি হয়ে এক বছর হিফয শোনান এবং ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের মুফতীয়ে আ'যম এবং দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. তাকে দারুল উলূমের জামে মসজিদে তাঁরই সুযোগ্য সাহেবজাদা বর্তমানে পাকিস্তানের মুফতীয়ে আ'যম এবং দারুল উলূমের মহাপরিচালক মুফতী রফী উসমানী সাহেব দা.বা.-এর তারাবীহর ইমামতিতে সামে' নিযুক্ত করেন।

হযরত রহ. তাঁর এই স্মৃতিকে প্রায়ই এভাবে উল্লেখ করতেন, 'আমার মহাসৌভাগ্য যে, তারাবীহর জামা'আতে সামে' হিসেবে আমি মুফতী শফী রহ.-এর পাশে দাঁড়াতাম। তাছাড়া রফী উসমানী সাহেব দা.বা.-এর সঙ্গে হিফযের দাওর করার জন্য প্রতিদিন হুযূরের বাসায় যেতাম। এই মোবারক স্মৃতি আমি কখনো ভুলতে পারবো না!'

দারুল উলূম করাচীতে কিতাব বিভাগে ইবতিদাইয়্যাহ থেকে মুতাওয়াসসিতাহ পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৭০ সালে 'উলূমে শরইয়্যার' সঙ্গে সঙ্গে 'উলূমে আসরিয়্যার' জ্ঞান লাভের জন্য করাচীর 'মাদরাসা তা'লীমুল ইসলামে' ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৭২ সালে করাচী শিক্ষাবোর্ডে প্রথম বিভাগে এস. এস. সি. পাশ করেন। অতঃপর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৭৪ সালে দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় জালালাইন জামা'আতে ভর্তি হন। সেখানে এক বছর পড়াশোনা করে জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসায় মেশকাত জামা'আতে ভর্তি হয়ে বাইতুল মুকাররমের সাবেক ভারপ্রাপ্ত খতীব এবং পেশ ইমাম মুফতী নূরুদ্দীন সাহেব রহ.-এর সঙ্গে ১৯৭৭ সালে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পর ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ শিক্ষাবোর্ডে এইচ.এস.সি পাশ করেন। অতঃপর বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ বিভাগের উর্দু অনুবাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ সালে

বাংলাদেশে অবস্থিত লিবিয়ান দূতাবাসের অনুবাদক হিসেবে যোগদান করেন। একই সময়ে মতিঝিল জামে মসজিদের খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ বছরই সৌদীর রাজধানী রিয়াদে গমন করে সৌদী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও অর্থ অধিদপ্তরের নথিপত্র কম্পিউটারে ডাটা তৈরীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সৌদী এয়ারফোর্সের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে আসেন। ১৯৯০ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঢাকাস্থ রাজকীয় সৌদী দূতাবাসের সামরিক শাখার প্রধান অনুবাদক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তদ্রুপ ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলোজী (আই.ইউ.টি)-এর খণ্ডকালীন অনুবাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুবাদ-দক্ষতায় তিনি ছিলেন আরবী, ইংরেজী, উর্দু এবং বাংলায় সমান পারদর্শী।

২০০২ খ্রিস্টাব্দে পরম বন্ধু এবং রিয়াদে অবস্থানকালীন সময়ের একান্ত সহকর্মী, তৎকালীন সময়ে আল মারকাযুল ইসলামীর আওতাধীন আদব বিভাগের মুদীর হযরত মাওলানা সাঈদ আল মেছবাহ সাহেব দা.বা.-এর উৎসাহ প্রদান এবং জোর অনুরোধে হযরত রহ. আল মারকাযুল ইসলামীর ভাষা-প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এবং সেখানে دورة التدريب على اللغات নামে এক বছর মেয়াদী ভিন্ন ধারার ভাষাপ্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তার এ কোর্সের সুনাম সুখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। উপমহাদেশে আরবী ভাষায় উর্দুর প্রভাব, ভাষাশিক্ষা ও অভিধানের দায়িত্ব, বাক্যগঠন-কৌশল, আরবী ভাষার শৈলী ও কাঠামো, ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের নুসূসের প্রায়োগিক ব্যবহার এবং বানানলিপি ও ক্যালিগ্রাফী তার রচিত মৌলিক প্রবন্ধ, যা পরবর্তিতে আরবী-ভাষা-গবেষকদের ডক্টরেট থিসিসে সযত্ন স্থান পেয়েছে। তার স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা মহিউদ্দীন ফারুকী এখন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চা ও সংকট বিষয়ে গবেষণাপত্র লিখছেন। দারুল উলূম করাচী এবং লালবাগ জামি'আয় পড়াশোনা করা সত্ত্বেও দূতাবাসে অনুবাদকের পেশা গ্রহণ সম্পর্কে তিনি প্রায়ই কৈফিয়তের সুরে বলতেন, 'আমার উস্তাদগণই আমাকে ওখানে পাঠিয়েছেন। আমি যখন লালবাগ থেকে দাওরায়ে হাদীস শেষ করি তখনই তৎকালীন সৌদী রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল খতীব সাহেব লালবাগ জামি'আয় আগমন করেন এবং আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব আমাকে দিয়ে তার শানে প্রশংসাপত্র পাঠ করান। পরবর্তীতে ফুয়াদ আব্দুল হামীদ সাহেব লালবাগের উস্তাদদের কাছে তার দূতাবাসের জন্য একজন অনুবাদকের আবেদন করেন। তখন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব রহ. এবং মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব রহ.সহ অন্যান্য উস্তাদগণ আমার নাম প্রস্তাব করেন। কোন কারণবশত তখন যোগদান না করলেও পরবর্তীতে তাদের পরামর্শক্রমেই এই পেশায় জড়িয়ে পড়ি।'

বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী এই মহান ব্যক্তির অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্বের ক্ষেত্রে পূর্ণ আমানতদারী, তাওয়াযু তথা নিজেকে ছোট মনে করা। প্রতি বছরই হুজুর প্রথম দরসে ছাত্রদেরকে এ কথা বলে দরস শুরু করতেন, 'আমাদের আসাতেযায়ে কেরাম, যাদের কাছে আমরা নাহব-ছরফ পড়েছি তাদের কেউ কেউ হয়তো আরবী বলতে পারতেন না কিংবা আরবীতে কিছু লিখতে পারতেন না– তার অর্থ এই নয় যে, তারা আরবী বুঝতেন না। বরং তারা আরবী শতভাগই বুঝতেন। আসল কথা হল, আরবী বোঝা এবং বোঝানো এটা আরবীর মূল অংশ। যার হক তারা পূর্ণরূপেই আদায় করে গেছেন। বাকি কথা হল, আরবী বলা এবং লেখা এটা ভিন্ন জিনিস। আমি এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা-মেহনত করেছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে সামান্য কিছু শিখতে পেরেছি।'

তার পরিচালিত ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য তিনি যে নেসাব তৈরী করেছেন তার নাম দিয়েছেন المنهج الابداعي। এবং একে কেন্দ্র করে একে একে রচনা করেছেন সাতখানা আরবী পাঠ্যগ্রন্থ।

১. ব্যবহারিক রচনা সম্পর্কে লিখেছেন الإنشاء الوظيفي

২. কুরআন এবং হাদীসই আরবী সাহিত্যের মূল। আধুনিক আরবী বলতে কুরআন হাদীসের বাইরে কিছুই নেই। পার্থক্য কেবল এতুটুকুই যে, পুরোনো শব্দগুলোই কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ দর্শনকে সামনে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন دروس التعبيرمن القران والحديث

৩. লেখালেখিতে ছাত্ররা যে সকল নাহব-ছরফ, ই'রাব, তা'বীর এবং ইমলাজনিত ভুলের শিকার হয়, সেগুলোকে চিহ্নিত করে রচনা করেছেন الدروس العلاجية

৪. আরবী বাক্যশৈলী ও বাক্যের ভেদ-রহস্য নিয়ে রচনা করেছেন أسرار الجمل

৫. এ যাবৎকাল পর্যন্ত তার লিখিত যে সকল প্রবন্ধ-নিবন্ধ সৌদী, পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন আরবী দৈনিকে কিংবা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো মলাটবদ্ধ হয়ে مقالاتي المختارة নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৬. আধুনিক আরব বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত লিপিশৈলী خط الرقعة অনুশীলনের জন্য রচনা করেছেন 'خط الرقعة অনুশীলন খাতা'।

৬. আরবী ভাষার দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকা পাঠে ছাত্রদেরকে পারদর্শী করে তোলার জন্য, পত্রিকার ভাষা বোঝা এবং পত্রিকার রিপোর্ট তৈরী করার যোগ্য করে তোলার জন্য রচনা করেছেন لغة الصحف নামক গ্রন্থ। (যন্ত্রস্থ)

মৃত্যুকালে হযরত রহ. এক পুত্র, তিন কন্যা ও স্ত্রী রেখে গেছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত রহ.-কে কামিল মাগফিরাত নসীব করুন এবং তাঁর কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দিন। তার পরিবার-পরিজনকে সবরে জামীল নসীব করুন। আমীন।

প্রস্তুতকারী : শিক্ষার্থী, ইফতা ১ম বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
ছাত্র, হযরত শহীদুল্লাহ ফযলুল বারী সাহেব রহ.

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... **অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের** কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১২

মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির মূল্য কতো তা নির্ভর করে সেটা কতদিন কাজে লাগবে এবং কোন কাজে লাগবে তার মূল্যমানের উপর। বাস্তবতা যদি তাই হয় তাহলে মানতে হবে, ইলমে দীনের সঙ্গে জাগতিক জ্ঞান-গরিমার কোন তুলনাই হয় না। কারণ জাগতিক বিদ্যার দৌড় ইহকালেই সীমাবদ্ধ। এতে পরকালের প্রথম ঘাঁটি ঈমানী মৃত্যুর নিশ্চয়তা নেই। মৃত্যুপরবর্তী কবরজগতে তার এক পয়সার দাম নেই। হাশরমাঠের হিসাব-নিকাশে তার কোন কার্যকারিতা ও অবদান নেই। জাগতিক বিদ্যা যদি দীনের কাজে ব্যবহার না হয় তাহলে বিশ বছর ধরে অর্জিত বিদ্যায় সামান্য সওয়াবেরও ওয়াদা নেই। বরং এই বিদ্যা ক্ষেত্রবিশেষে ইহকালেই আদম সন্তানকে 'মানুষ' বানানোর পরিবর্তে ইতর প্রাণীর কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়, এমনকি গুরুত্বের সাথে কোন দীনদার মানুষের সাহচর্যে মনুষ্যত্বের প্রশিক্ষণ না নিলে বিদ্যার্থীকে পশুরও অধম করে দেয়। বোঝাই যায়, এই বিদ্যার জৌলুস কতোটা সীমিত সময়ের, কতোটা সীমিত পরিসরের এবং এর পরিণাম কতোটা অস্পষ্ট।

পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর ইলমের বর্ণমালা থেকেই সওয়াবের কাজ। কাজে লাগানো ছাড়া শুধুমাত্র শিক্ষা করাটাই স্বতন্ত্র ইবাদত। ইহকালে মর্যাদাবানদের কাছেও তার মর্যাদা, কবরেও সাহায্যকারী, হাশরেও সুপারিশকারী, অতঃপর অনন্তকালের রাজত্ব তো আছেই। যে অর্থ না বুঝে শুধুমাত্র শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম পড়তে ও পড়াতে পারে তাকেও আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের সনদ। আর যদি মর্ম বুঝে পূর্ণাঙ্গ আলেম হয়ে ইলম অনুযায়ী আমল করে তাহলে এক হাজার ইবাদতগুযার সাধারণ দীনদারের তুলনায় অধিক দামী। বদদীন, ঘুষখোর, সুদখোর, প্রতারক ও যুলুমবাজরা তো কোন গণনাতেই নেই।

এমন দামী ইলমের মূল্য যদি কখনও একজন আলেমের কাছেই তুচ্ছ হয়ে যায়, এটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এমন অবুঝ লোককে ছোটখাটো অপমান আর বালা-মুসিবতে গ্রেফতার করে সতর্ক করেন। সতর্ক হলে তো ভালো, অন্যথায় মূল্যবান ইলমের অবমূল্যায়নের কারণে একপর্যায়ে তাকে গোমরাহীর পথে পরিচালিত করা হয়। তার বংশে আর কেউ আলেম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে না। আমাদের কাছে এর বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

এই লেখা আমাদের এক সিনিয়র বন্ধু (বড়ভাই) সুকণ্ঠের অধিকারী হাফেযে কুরআন, মুফতী সনদপ্রাপ্ত, আমলদার সুযোগ্য আলেমের একটি ভুল ও ভুলের খেসারত প্রসঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রাথমিক সতর্ক করেছেন, সংকেত পেয়ে তিনিও সতর্ক হয়ে গেছেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষার উপাদান।

আমাদের বড়ভাইটি ঢাকার এক চাকরীজীবি পরিবারের ছেলে। তার সঙ্গে আমার পরিচয় দেশের বাইরে প্রবাসে। ইফতা কোর্সে তিনি আমাদের এক বছরের সিনিয়র। কোর্স শেষে দেশে ফিরে একটা প্রাইভেট মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। মাওলানা-মুফতীর উপাধি টপকে তার সুমধুর তিলাওয়াতই তাকে খ্যাতি এনে দিল। মহল্লাবাসীও তাকে নিয়ে গর্বিত। পার্শ্ববর্তী মহল্লার এক বিশাল ও সুরম্য মসজিদের কর্তৃপক্ষ একরকম জোর করেই তাকে খতীব পদে নিয়োগ দিল। কর্তৃপক্ষ ও মুসল্লীরা তার কথায় উঠে-বসে। মোটকথা, হাফেয, আলেম ও মুফতী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাকে যথার্থ দীনী খেদমতের সুযোগ করে দিয়েছেন।

এবার সংসার গড়ার পালা। আমার একমাত্র বোনের ব্যাপারেও তার আগ্রহ ছিল। এ উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার বোন তখনও বিবাহযোগ্য না হওয়ায় আগ্রহের কথা বেশি জানাজানি হয়নি। তার জন্য উপযুক্ত পাত্রী খুঁজতে আমরাও চেষ্টা কম করিনি। আমি তাকে যে পাত্রীর সন্ধান দিয়েছিলাম তিনি বর্তমানে মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. কর্তৃক সম্পাদিত *প্রচলিত জাল হাদীস* নামক বইয়ের মূল লেখকের সহধর্মীনী। আর্থিক অসামঞ্জস্য বা অন্য কোন কারণে 'বড়ভাইয়ে'র পরিবার সেখানে আত্মীয়তায় আগ্রহবোধ করেননি। আসল কথা হল, তাকদীরের ফয়সালা ছিল না। আমার দৌড় এখানেই শেষ। এ বিষয়ে আমি এর চেয়ে বেশি অবদান রাখার চেষ্টা বাদ দিলাম।

কিছুদিন পর জানতে পারলাম, তিনি এক বিশিষ্ট শিল্পপতি পরিবারে বিয়ে করেছেন। শিল্পপতি হলেও তারা পরিপূর্ণ দীনদার। ভাবীর ছোট ভাই (বয়সে ভাবীর বড়) দারুর রাশাদ মাদরাসায় শর্টকোর্সে পড়ে মাওলানা হয়েছেন। ভারত হতে বুযুর্গ ব্যক্তিগণ এদেশে আগমন করলে মেহমানদারীর সুযোগ পেলে তাদের বাড়ি-গাড়ি একদম ফ্রি। ভাবীর বড় ভাই ব্যবসার কর্ণধার; আমাদের বড় ভাইকে প্রথম দিন দেখে মন্তব্য করেছিলেন–ছেলেটার চেহারা থেকে আভিজাত্য টপকায়। এমন যোগ্য জামাইকে তাদের গোটা পরিবার মাথায় রাখবে, না কোলে রাখবে তা নিয়ে রীতিমত হিমশিম খায়। বিয়ের অনতিপর জামাইকে তারা নিজেদের বায়িং হাউজে ডাইরেক্টর পদে অফিস করার দায়িত্ব প্রদান করে এবং যাতায়াতের জন্য গাড়িও দিয়ে দেয়। গাড়ি নিয়ে অবসর সময়ে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। এক-দু'বার আমারও তাতে চড়ার সুযোগ হয়েছিল।

মিয়া-বিবির নতুন দাম্পত্য জীবন যেমন করে চলার তেমনই চলছিল। বিবিকে নিয়ে ভাই সাহেব এদিক সেদিক বেড়াতে যান। মাঝে-মধ্যে কেনাকাটায়ও বের হন। দেখা-সাক্ষাতে আমাদের কাছে স্ত্রীর প্রশংসা করে বলতেন–বেশি অভিমানী,

বয়স কম, বুঝ কম, আদরের দুলালী, সংসার কি জিনিস এখনও বোঝে না। ক'দিন পর সব বুঝবে ইনশাআল্লাহ।

এখন তার তিনটি পদ। প্রাইভেট মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মসজিদের ইমাম-খতীব এবং একটি প্রসিদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর। ডাইরেক্টর পদের সঙ্গে মাদরাসার পরিচালক ততোটা বেমানান না হলেও মসজিদের ইমাম-খতীবের সঙ্গে বর্তমানে কিছুটা বেখাপ্পা। কারণ বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদের ইমামগণ বাস্তবে ইমাম (নেতা) নন; গোলাম। চাকরী ঠিক রাখতে হলে মূর্খ ও বদদীন কমিটির অধীনস্ত হয়েই থাকতে হয়। ইমাম সম্পর্কে প্রচলিত এ ধারণা বড় ভাইয়ের শিল্পপতি পরিবারের আত্মমর্যাদায় বাঁধবে এটাই স্বাভাবিক। সম্ভবত তাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু ইঙ্গিতও বড়ভাই পেয়েছেন। কাজেই তিনি ইমামতির বিষয়ে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছেন। একপর্যায়ে মসজিদ কমিটির কাছেও সে ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। কমিটি তাকে অনেক শ্রদ্ধা করত, প্রকৃত অর্থেই ইমাম মানত। তার ইচ্ছার দৃঢ়তা দেখে কমিটি বলল, ঠিক আছে, আপনি যদি না-ই থাকেন, আমাদেরকে আপনিই একজন যোগ্য ইমাম ঠিক করে দিবেন। আমরা নিজেরা কোন ইন্টারভিউ নিব না।

তিনি মনে মনে ইমাম খুঁজতে শুরু করলেন। ইতোমধ্যে এক মিটিংয়ে আমরা একসাথ্ হলাম। মিটিং শেষে একান্তে আমাকে বললেন, মুফতী সাহেব! আপনি আমার মসজিদে চলে আসেন। এই পরিমাণ বেতন, এই এই সুবিধা। বললাম, আপনি? তিনি উত্তর দিলেন, আমার পক্ষে এখন মসজিদের দায়িত্ব পালন সম্ভব হচ্ছে না। আমি বললাম, আমার পক্ষে তো এখানে এসে ইমামতি করা সম্ভব হবে না। কারণ মাদরাসা থেকে দূরে হয়ে যাবে। তিনি বললেন, যোহর-আসর আপনার পড়ানো লাগবে না; আমিও তো পড়াই না। বললাম, আমি তো শিক্ষকতার পাশাপাশি ইমামতিতে বিশ্বাসী; ইমামতির পাশাপাশি শিক্ষকতায় নয়। কাজেই কয়েকটা ক্লাস করে মাদরাসা ছেড়ে চলে অন্য এলাকায় থাকা সম্ভব নয়। বিকল্প হিসেবে আমি কলাবাগান বাসস্ট্যান্ড বাইতুস সালাহ জামে মসজিদের খতীব সাহেবকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনি একদিন ইশার নামাযও পড়িয়েছেন, কিন্তু যে কোন কারণে তিনিও সেখানে নিযুক্ত হননি। পরে তারা অন্য কাউকে ইমাম-খতীব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। আর বড় ভাই অপমান (?) মুক্ত হয়েছেন। শ্বশুর পক্ষ যথেষ্ট আনন্দিত। জামাইকে এখন খুব ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছে। কিন্তু সমস্যা বাঁধল আমাদের ভাবীকে নিয়ে। তার অভিমানের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। যাকে এখন আর অভিমানের গণ্ডিতে রাখা চলে না। দূরত্ব কিংবা অপছন্দই বলতে হয়। বড় ভাই কোন কারণই খুঁজে পায় না। যতই স্ত্রীর কাছকাছি যেতে চায় তিনি এড়িয়ে যেতে চান। দূরত্ব কমানোর জন্য ভাই সাহেব যা-ই করেন দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। বিষয়টা তার শ্বশুর পরিবারেরও নযরে আসে। তার ভাবীরা বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে কোন কারণও বলে না। শুধু এতটুকু বলে যে, তার সাথে আমার মনের মিল হয় না। আমি যেটা পছন্দ করি সেটা তার পছন্দ হয় না। আর তার যেটা পছন্দ সেটা আমার পছন্দ হয় না। উদাহরণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, যেমন ধরুন একটা বেডসিট, একটা গ্লাস সেট ইত্যাদি, ইত্যাদি সব তুচ্ছ উদাহরণ। আমাদের আরেকজন শ্রদ্ধেয় সিনিয়র। তার আহলিয়ার সাথে বড়ভাইয়ের বিবির পূর্ব থেকেই সখ্যতা ছিল। তিনি তার আহলিয়াকে পাঠালেন তার মনের কথা জানার জন্য। তিনি জানালেন যে, আসলে তিনি ভালো আলেম, দেখতেও ভালো, সবই ঠিক। কিন্তু তিনি রোমান্টিক না। দেখ, তিনি বাসর রাতে আমার জন্য মাত্র একটা গোলাপ পকেটে করে নিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন, তিনি আলেম মানুষ, একটা ফুল নিয়ে এসেছেন এ-ই তো বেশি। দস্তর মত ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে একজন আলেম মানুষ কী করে শ্বশুর বাড়িতে প্রবেশ করে। তিনি বললেন, আপা! যা-ই বলেন, আমার ভালো লাগে না। ভাবীর ভাইয়েরাও চেষ্টা করল। বলতেন, ছেলেটার তো কোন ত্রুটি দেখি না। কী করে সংসারটা ভাঙবো! বড় ভাই সে সময় চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কিচ্ছুতেই কাজ হল না। অগত্যা সংসার ভেঙ্গে গেল। ভাবীর ভাই আমাদের বড় ভাই ও তার পরিবারের কাছে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

আমি এ ব্যাপারে যতই চিন্তা করি কারণ হিসেবে আমার মনে আসে, শ্বশুর পক্ষের অঘোষিত আবদারে সাড়া দিয়ে সম্মানজনক ইমামতির দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেছেন। ফলে তাকে সতর্ক করার জন্য তার দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙ্গে দিয়েছেন। পরে অবশ্য তিনিও বুঝতে পেরেছেন। বড় ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি যশোর নোয়াপাড়ায়। পরবর্তীতে তিনি দেখেশুনে এলাকাতেই বিবাহ করে নিয়েছেন। ফের মাদরাসায় মনোযোগ দিয়েছেন এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদে পুনরায় ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব নিয়েছেন। মসজিদটি পূর্বের মসজিদের তুলনায় ছোট; তবে বেশি ছোট নয়।

এরপর কয়েক বছর কেটে গেল। আমাদের মহল্লা থেকে তিন দিনের জামাআত গেল আমার সেই বন্ধুর এলাকায়। তারা জানতে পারল যে, পাশের মসজিদে আমার এক বন্ধু ইমাম-খতীব এবং সেখানকার মাদরাসার প্রধান শিক্ষক। তারা ফোনে আমাকে নুসরতে যেতে বললেন এবং জানালেন, এখানে আপনার এক বন্ধুর সাথে দেখা হবে। আমি গেলাম এবং সাথীদের সঙ্গে মাগরিব পড়ে বয়ান শেষে দু'জন সাথীসহ পার্শ্ববর্তী মসজিদে গিয়ে দেখি, আমাদের সেই বন্ধু। বড় ডেস্ক সামনে নিয়ে মসজিদসংলগ্ন মাদরাসার অফিস কক্ষে বসে আছেন। আমাকে দেখে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। মেহমানদারী করলেন। আমি বাল-বাচ্চার খোঁজ খবর নিলাম। তিনিও নিলেন। তার পিছনে ইশার নামায পড়ে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। আর মনে মনে শুকরিয়া আদায় করলাম যে, আল্লাহ তা'আলার দেয়া সংকেতে আমার বড়ভাই সময়মতোই ভালোভাবে সতর্ক হয়েছেন। নিজের মূল্যবান ইলমের সঙ্গে মানানসই অবস্থানে ফিরে এসেছেন। ভাই সাহেব এখন দাম্পত্য জীবনে মহাসুখে আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সুখের দাম্পত্য আখেরাতেও বহাল রাখুন। আমীন।

লেখক : আবু তামীম

অল্প কথা গল্প নয়

মক্কা-মদীনার স্মৃতি

স্মৃতির মিনারে মিনা'র স্মৃতি

১০ই যিলহজ্জ বড় শয়তানের প্রতীকী স্তম্ভে পাথর মেরে বেলা সাড়ে এগারোটায় মক্কায় পৌঁছলাম। ফরয তাওয়াফ করে যোহর পড়ে একবারেই বাসায় ফিরব– এই ছিল এরাদা। উযূখানায় লাইনে দাঁড়িয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়েছি। মিসডকলের তালিকায় পরিচিত নম্বর থেকে অনেকগুলো কল। ব্যাক করতেই শাশুড়ি-আম্মার উদ্বেগাকুল কণ্ঠ–তোমরা কোথায়? সুস্থ আছো তো? নিরাপদ আছো তো? বিপদাপদ হয়নি তো? সাফওয়ার নানা কোথায়? অন্যেরা কেমন আছে? একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে তিনি দম নিলেন। বললাম, আমি তো এইমাত্র পাথর মেরে মক্কায় পৌঁছেছি। জামারায় ওঠার পরপরই দলের এক হাজী সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে সঙ্গ দেয়ায় আমি দলছুট হয়ে যাই। বাবাজী আমার আগেই পাথর মেরেছেন। মক্কায় এসে এতক্ষণে তার ফরয তাওয়াফ করার কথা–কেন, কী হয়েছে? বললেন, গাজিপুর থেকে তোমার বড় ভায়রা ফোন করেছিল, ইন্টারনেটে নাকি দেখেছে–মিনায় পাথর মারতে গিয়ে পাঁচ/ছয়শ হাজী পদদলিত হয়ে মারা গেছেন। শোনার পর থেকে খুব চিন্তায় আছি। বললাম, 'বাবাজী আমার আগেই পাথর মেরেছেন। আমি তার মিনিট বিশেক পর একই তলায় পাথর মেরেছি। সম্ভবত তিনি ভালই আছেন। অমন কিছু হলে আমাদের নজরে পড়তো। আর খবরটি মনে হয় গুজব–ক্রেন বিধ্বস্ত হওয়ার পর থেকে কিছু লোক ইন্টারনেটে এসব ছড়াচ্ছে। তাছাড়া জামারা এখন এতোটাই প্রশস্ত যে, কেউ ইচ্ছা করে পড়ে গেলেও পদদলিত হওয়ার আশঙ্কা নেই; বড়জোর অতিউৎসাহী হাজির নিক্ষেপিত পাথর ছিটকে এসে কারও মাথা-টাথা যখম করতে পারে–এর বেশি নয়। আমি এক্ষুণি বাবাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে জানাচ্ছি।' শ্বশুরজীকে ফোন করে যা ধারণা ছিল, মাতাফেই পেলাম। শুনে তিনিও বললেন, গুজবই হবে, আমরা তো সব স্বাভাবিকই দেখে এলাম। তারপর ফোন করলাম তিন ভগ্নিপতির কাছে। তারাও এ বছর আল্লাহর ঘরে এসেছেন। রিং হল কিন্তু তিনজনের একজনও রিসিভ করছে না। মনের ভেতর কোথায় যেন খচ্ করে উঠল। পাত্তা দিলাম না। আরে! কত কাজ আজকে–পাথর মারা, ফরয তাওয়াফ, কুরবানী, মাথা মুণ্ডন। সবাই কি আর ফোন ধরার জন্য বসে আছে? তাওয়াফ করে নেই, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু মসজিদুল হারামের উদ্দেশ্যে এগোতেই দেখি, পা দুটো সাড়া দিচ্ছে না। মনের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে গেছে। শারীরিক ক্লান্তি আর মনের খচ্খচানি বলছে, এ অবস্থায় তাওয়াফে মন জমবে না। অগত্যা উল্টো পায়ে বাসার দিকেই হাঁটা দিলাম। বাসার গলিতে প্রবেশ করতেই শিড়দাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। প্রতিটি হোটেলের নিচতলায় টিভির সামনে মানুষের জটলা। যা বোঝার বুঝে গেলাম। একবৃদ্ধের খেদোক্তি– 'হজ করতে আয়া যা সব করি, গজব তো আইবোই, আমরা কি আর ভালা মানুষ নি?' সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী নিহত হাজির সংখ্যা সাতশ'র উপরে। মনের কাঁপুনি হাতের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। কম্পিত হাতে মোবাইলের বাটন টিপে যাচ্ছি। মনে হল একবছর পর ভগ্নিপতিদের একজন ফোন রিসিভ করলেন। তার কাছেই বাকি দু'জনের সংবাদ পেলাম। তাদের তাঁবু জামারার কাছকাছি হওয়ায় সকাল সকাল সব কাজ সেরে বাসায় ফিরে আরাম করছিলেন। তারপর এই হোটেল থেকে ওই হোটেলে, এই নম্বর থেকে ওই নম্বরে যোগাযোগ করে জানলাম, আল্লাহর মেহেরবানিতে পরিচিত সবাই নিরাপদে আছেন। অতঃপর দেশে ফোন করে আব্বা-আম্মাকে জানালাম। তারা আমার কাছ থেকেই প্রথমে শুনেছেন বলে চরম পেরেশানী থেকে বেঁচে গেছেন। বিকেল তিনটা পর্যন্ত কাফেলার ৭/৮জন নিখোঁজ। আসরের সময় তিনজনের খোঁজ পাওয়া গেল, নিতান্ত বিধ্বস্ত অবস্থা। বাকি চারজনের তিনজন শহীদ। একজন ফিরে এল দুদিন পর, হাসপাতাল থেকে। সুস্বাস্থের অধিকারী হাসিখুশি মানুষটি একেবারে নির্বাক। কী হয়েছিল, কোথায় ছিল কিছু বলে না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, আর নিঃশব্দে কাঁদে। কয়েকদিন পর বিকেলে ফেরা তিনজনের একজনকে–যখন তারা কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছেন–জানতে চাইলাম, কী হয়েছিল সেদিন? শুনুন তারই যবানীতে–

'মাঝখানে সামান্য ফাঁক রেখে অনেকগুলো ইট লম্বালম্বি দাঁড় করানোর পর একটাকে আরেকটার গায়ে ঠেলে দিলে যেভাবে একের পর এক পড়তে থাকে–সেদিনের অবস্থাও ঠিক ওরকম ছিল। সকাল আটটায় তাঁবু থেকে বের হয়েছিলাম। সঙ্গে হুইলচেয়ারে বৃদ্ধ পিতা। অসুস্থ, মাযূর। বেশি ভিড়ের আশঙ্কায় টিনশেডের পথ ধরিনি; যে পথে আপনারা গিয়েছিলেন। এখন আফসোস হয়, কেন এতগুলো আলেমের অনুসরণ না করে নিজের বুদ্ধিতে ওপথ ধরেছিলাম! মুযদালিফা-মিনার মাঝ বরাবর যে পথটি জামারায় গিয়ে উঠেছে আমরা ওই পথটিকে বেছে নিয়েছিলাম। মাথার ওপর সূর্যটা ৪৮/৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাত্রায় তাপ ছড়াচ্ছিল। হুইলচেয়ার ঠেলার কারণে ছাতা মেলার সুযোগ নেই। এ পথে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। সঙ্গে আনা ৬০০ মি.লি.-এর বোতলটাই ভরসা। একসময় তা-ও শেষ হয়ে গেল। জামারা তখনও এক মাইলের মত বাকি। দূর থেকে দেখা যায়। যতই এগোচ্ছি ভিড় বাড়ছে। একসময় থেমে গেল চলা। দাঁড়িয়ে পড়লাম। গলাগলি ভিড়। শরীরের তাপে, সূর্যের উত্তাপে বাতাস ঘন হয়ে আছে। শ্বাস নেয়াই মুশকিল। তাপদাহে, তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সামনে যাওয়ার উপায় নেই। পেছনে সবাই গায়ে গা লাগানো। কিন্তু হঠাৎ এভাবে থেমে পড়ার কারণ বুঝতে পারছিলাম না। তারপর...

দৃশ্যটি হঠাৎ করেই নজরে পড়ল। দীর্ঘকায় হওয়ায় অনেকের আগেই আমি তা দেখেছিলাম। পয়লা নজরে দূরে ইহরামের শুভ্র মিছিলকে ওই ধাক্কা খাওয়া ইটগুলোর মতই মনে হচ্ছিল। কিংবা মনে হচ্ছিল, কাশবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক শক্তিশালী টর্নেডো, আর তার ধাক্কায় ফুলগুলো নুয়ে পড়ছে একের পর এক; পড়েছে তো পড়েছে ওঠাউঠির নাম নেই। কিন্তু কেন, তা বোঝা যাচ্ছিল না। যখন বুঝলাম, মৃত্যু দুয়ারে কড়া নাড়ছে। ধাক্কার ধামাকা আর মাত্র ৫০/৬০ হাত দূরে। কোত্থেকে এল শক্তি, কোথা হতে মনোবল কিছুু জানি না–ক্ষিপ্রগতিতে আব্বাকে চেয়ার থেকে টেনে তুললাম। অবস্থার ভয়াবহতা তিনিও টের পেয়ে গেছেন। তারপর

একঝটকায় মাথার ওপরে তুলে অপটু গাছবাওয়া লোককে নিচ থেকে ঠেলে তোলার মত পার্শ্ববর্তী একতলা উঁচু গ্রিলের উপরের অংশটি হাতে ধরিয়ে দিলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিজের আওয়াজ নিজেই চিনতে পারছি না। ফ্যাসফ্যাস করে বললাম, যেভাবেই হোক, ওপাশে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আব্বার পিছু পিছু আমিও শুরু করলাম গ্রিল বাওয়া। তার ঝুলন্ত পা আমার কাঁধে বাধিয়ে নিচ থেকে ঠেলতে লাগলাম। একসময় আমার হুইলচেয়ারী আব্বা, কীভাবে আল্লাহই ভাল জানেন, গ্রিলের ওপরে উঠে সংলগ্ন তাঁবুর চালে বসতে সক্ষম হলেন। আরেকটু হলে আমিও উঠে যাই...। এমন সময় কে যেন কাঁধের ব্যাগটি সজোরে আঁকড়ে ধরল। আলেমদের মুখে শুনেছি, নবীর সুন্নাতকে মাঢ়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হয়, কিন্তু আঁকড়ে ধরা যে কী জিনিস আজ তা টের পেলাম। পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে গেছে, কাজ করছে না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে উঠল, যেভাবেই হোক তোমাকে ঝুলে থাকতে হবে; হ্যাঁ, হ্যাঁ ঝুলে থাকতে হবে এবং থাকতেই হবে; পড়ে গেলে, এই মিনার ময়দানই তোমার গোরস্থান। সর্বশক্তি দিয়ে গ্রিল আঁকড়ে ঝুলে রইলাম। গ্রিল তো নয় পুলসিরাত ধরে ঝুলছি। নীচে হিমশীতল মৃত্যুর হাতছানি। আমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ঝুলছি আর আমার পা ধরে ঝুলছে আল্লাহর আরেক বান্দা। ব্যাগের রশিটি ফাঁসির দড়ি হয়ে দু' কাঁধ চেপে ধরেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার গ্রাস করছে চারদিক। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে চোখের মণি। আল্লাহ গো, বাঁচাও! এবার বেঁচে গেলে জীবনেও তোমার নাফরমানী করব না। কীভাবে জানি না, সকল মনোযোগ, সমস্ত জীবনী শক্তি একত্রিত করে একহাতে ঝুলে আরেকটি হাত ছেড়ে দিলাম। উদ্দেশ্য, ব্যাগটি শরীর থেকে নামিয়ে দেয়া। সফল হলাম। একদিকের রশি ছাড়াতে পারলাম। রশির সঙ্গে কিছু গোশ্তও যেন কাঁধ থেকে চলে গেল। যাক না, বেঁচে থাকলে গোশ্ত ছাড়াও জীবন চলবে। কিন্তু বাঁচতে পারবো তো? কীভাবে? আরেক হাতে তো গ্রীল ধরা! এবং সেই হাতের ভরে ঝুলে আছি দু' দু'জন বনী আদম। দু'জনই বাঁচতে চাই। অপর হাত থেকে রশি ছাড়াতে হলে ছাড়ানো হাত দিয়ে গ্রিল ধরে নিতে হবে। কিন্তু ছাড়ানো হাতটি কিছুতেই আর গ্রিলের কাছাকাছি নিতে পারছি না। ঠিক এই মুহূর্তে, হ্যাঁ এই চরম মুহূর্তে আমার তাকদীর সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়ালও বুক ফুলিয়ে, বিজয়ীর বেশে। ঝুলন্ত ভাইটির ভারে রশিটি ছিড়ে গেল। আমি ভারমুক্ত হলাম। ফিরে পেলাম নতুন জীবন। আহা জীবন! তুমি কত মধুর!! এক পলকের তরে ভাগ্যাহত (আসলে শাহাদাত লাভে ভাগ্যবান) ভাইটির দিকে তাকিয়েছিলাম। সে-ও হিমহিম চোখে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। নিষ্পলক। সে চোখে দৃষ্টি নেই...। মিনার ছোট্ট কিয়ামতে এতক্ষণ শুধু ইয়া নফসী, ইয়া নফসী চলছিল। এবার আব্বার কথা মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখি, তিনি তাঁবু বেয়ে বেয়ে একটু ভেতরের দিকে চলে গেছেন। আমিও চাল বাওয়ার মতো করে হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে পৌঁছলাম। এভাবে দুই তাঁবু দূরে গিয়ে কয়েকজনের সহায়তায় তাকে নিচে নামালাম। একটু দম নিয়ে ছুটে গেলাম 'হাশর ময়দান'-এর খবর নিতে। যতদূর দৃষ্টি যায় লাশ আর লাশ। আমার স্মৃতির মিনারে এখন অজস্র শ্বেত-বলাকা, মিনার ময়দানে ইহরামের শুভ্র লেবাস যাদের হয়েছে কাফন।

আবূ সফওয়া

ঢাকা জামিআ ইসলামিয়া
বাড়ি- ৩৪, রোড- ০৭, সেক্টর- ০৪, উত্তরা মডেল টাউন

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বিভাগসমূহ

আত-তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা (দুই বছর মেয়াদী)
আত-তাখাসসুস ফি উলূমিল হাদীস (দুই বছর মেয়াদী)
উভয় বিভাগে সীমিত কোটায় ছাত্র ভর্তি করা হবে।

ভর্তির শর্তাবলি
ভর্তিচ্ছু ছাত্রকে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীসে উত্তীর্ণ হতে হবে।
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
মুত্তাকী মেহনতী ও সর্বপ্রকার ঝামেলামুক্ত হতে হবে।
অধ্যয়নের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সার্বিক বিবেচনায় যোগ্য হতে হবে।

নিবেদক
মুফতি লুতফুর রহমান ফারুকী
প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম, ঢাকা জামিআ ইসলামিয়া।

ভর্তির নিয়মাবলি
আত-তাখাসসুস ফি উলূমিল হাদীস
এই বিভাগের লিখিত পরীক্ষা : বুখারী (১ম খণ্ড)।
মৌখিক পরীক্ষা : ফাতহুল বারী ও সংশ্লিষ্ট যে কোনো কিতাব।
আত-তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা
এই বিভাগের লিখিত পরীক্ষা : হিদায়া, কিতাবুল বুয়ূ।
মৌখিক পরীক্ষা : ফাতহুল কাদীর ও সংশ্লিষ্ট যেকোনো কিতাব।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ৮ শাওয়াল হতে ১৫ শাওয়াল।
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭০৩৪৪৪৪৪৪, ০১৮৭৩৬৬৬৬৬৬

যাতায়াত : উত্তরা অথবা জসিমউদ্দিন থেকে মেইন রোডের পূর্ব পার্শ্বে, সি-সেল চাইনিজ রেস্টুরেন্টের পিছনে।

গ্রন্থ পরিচিতি

উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের সামান্য সান্নিধ্যও উম্মতের জীবনে অসামান্য সৌভাগ্য বয়ে আনে। সাহাবায়ে কেরাম এর সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। নবীজীর অবর্তমানে এখন তাঁর সান্নিধ্য লাভের একমাত্র মাধ্যম তাঁর পবিত্র সীরাত ও সুমহান জীবন-চরিত। একজন উম্মতি কার্যকর পন্থায় সীরাত অধ্যয়নের মাধ্যমে আজও পেতে পারে নববী সান্নিধ্যের অমূল্য সম্পদ। এই সান্নিধ্য খাঁটি ঈমানের জন্য যেমন জরুরী, তেমনই জরুরী নেক আমলের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ অর্জনের নিমিত্তে। কেননা কারো ঈমান-আমল তখনই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় যখন তা সীরাতের সঙ্গে পূর্ণ সাজুয্য রক্ষা করে।

সীরাতের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্ক বৃক্ষ ও শেকড়ের মতো। শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে বৃক্ষ যেমন প্রাণে বাঁচে না, সীরাতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছাড়া মুসলিম উম্মাহরও অস্তিত্ব বজায় থাকে না। উম্মাহকে বাঁচার মতো বাঁচতে হলে, জাতিকে সতেজ ও সজীব রাখতে হলে নির্ভরযোগ্য সীরাত অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপনের বিকল্প নেই।

প্রিয় পাঠক! মুসলিম কি অমুসলিম সর্বযুগেই সীরাতুন্নবী ছিল পৃথিবীর সকল বিশিষ্ট লেখকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এ সুবাদে উম্মাহ লাভ করেছে সীরাতের এক সুবিশাল ভাণ্ডার। সাধারণত লেখকের হৃদয়ের উত্তাপ শব্দের হাত ধরে পাঠকের হৃদয়েও তাপ সৃষ্টি করে। লেখকের কলম, কলব ও জীবন যদি সমান্তরাল হয় তাহলে পাঠকের জীবনও হয়ে ওঠে সতেজ, সরস ও সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে লেখকের প্রাণ-সত্তাই যদি হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিরস ও নিষ্প্রাণ তাহলে পাঠকের আর পাওয়ার কী থাকে? আলোচ্য সীরাতগ্রন্থ 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সীরাতুন্নবীর আলোকে উদ্ভাসিত, সুন্নাতে নববীর প্রাণরসে সিক্ত ও পরিতৃপ্ত এক নবীভক্তের কলিজার খুন ও কলমের কালিতে সিঞ্চিত।

এটি লিখেছেন হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা, শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.-এর আধ্যাত্মিক রাহবার ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.।

লেখকের জন্ম ও বংশ : আরেফ বিল্লাহ ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. ৮ই মুহাররম ১৩১৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সুবহে সাদিকের সময় ভারতের উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি-সংলগ্ন বাওয়ানী অঙ্গরাজ্যের বুন্দেলখণ্ড পরগণার কাদুরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আলী আব্বাস সিদ্দীকী, দাদার নাম কাযেম হুসাইন। হযরত আরেফী রহ.-এর বংশ পরম্পরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-এর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

শিক্ষা-দীক্ষা : তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কুরআনে কারীম পড়া শেষ করেন। মৌলবী কাযেম হুসাইন রহ. প্রিয় দৌহিত্রকে কুরআনে কারীম শিক্ষাদানের পাশাপাশি আরবী ব্যাকরণ ও ফারসী ভাষার প্রাথমিক কিতাবাদিও পড়িয়ে দেন। এরপর সাধারণ শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তর পাশ করে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে আলীগড় এম.এ.ও কলেজ থেকে এফ.এ এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে বি.এ পাশ করেন। অতঃপর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাশ করেন।

কর্মজীবন : শাইখ আরেফী রহ. পড়াশোনা শেষ করে ওকালতী পেশা গ্রহণ করেন। কিন্তু একপর্যায়ে আইন পেশার কুটিলতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ পেশা বর্জন করেন এবং হযরত থানবী রহ.-এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এ পেশায় তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা : শাইখ আরেফী রহ. ছাত্রজীবন থেকেই হযরত থানবী রহ.-কে মহব্বত করতেন। তখন থেকেই তার সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা, তার রচনাবলী অধ্যয়ন করা, ওয়ায-মাহফিল শোনা ইত্যাদি কার্যক্রম জারী ছিল। অতঃপর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে আগস্ট হযরত থানবীর হাতে আনুষ্ঠানিক বাইয়াত হন। কঠোর পরিশ্রম, সাধনা ও রিয়াযত-মুজাহাদার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করানোর পর হযরত থানবী রহ. তাকে খিলাফত প্রদান করেন।

বিশেষ গুণ : খোদাভীরুতা, আত্মবিলোপ, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি, সরলতা, পরিচ্ছন্নতা, স্নেহ-মমতা, সম্প্রীতি, ধৈর্য ও সহনশীলতাসহ বহু গুণের আধার এ মনীষী অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যে কোন মূল্যে সুন্নাতের অনুসরণে তার কোন তুলনা ছিল না।

মৃত্যু : ১৫ই রজব ১৪০৬ হিজরী মোতাবেক ২৭শে মার্চ ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ৯০ বছর বয়সে ফজরের আযানের পর আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকী উসমানী দা.বা. তার জানাযা নামাযের ইমামতি করেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ মুসলমানদের এক বিশাল জামাআত তার জানাযায় শরীক হয়।

রচনাবলী : তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এই-

(১) উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, (২) বাসাইরে হাকীমুল উম্মত রহ., (৩) মা'আরিফে হাকীমুল উম্মত রহ., (৪) ইসলাহুল মুসলিমীন, (৫) আহকামে মাইয়িত, (৬) জাওয়াহিরে হাকীমুল উম্মত রহ., (৭) মা'মূলাতে ইয়াওমিয়্যা।

উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সুন্নাতের অনুসরণ হযরত আরেফী রহ. এর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যত কঠিনই হোক না কেন তিনি সুন্নাত অনুযায়ীই সকল কাজ সমাধা করতেন। আমলের সুবিধার্থে তিনি কুরআন, হাদীস, হযরত থানবী রহ.-এর রচনাবলী এবং অন্যান্য কিতাবের সহযোগিতায় বিভিন্ন কাজের সুন্নাত তরীকাসমূহ একটা খাতায় নোট করে রাখতেন। অতঃপর সেটা দেখে দেখে করে গুরুত্বের সাথে সুন্নাতের পাবন্দী করতেন। পাশাপাশি অন্যান্যদের দিকনির্দেশনার জন্য বিভিন্ন হাদীসের কিতাব ও সীরাতগন্থ থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্রিত করেন। এটাই পরে উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে

প্রকাশিত হয়। যা আলোকবর্তিকা হয়ে মুসলিম উম্মাহর লক্ষ লক্ষ সদস্যকে আলো বিলাচ্ছে।

উদ্দেশ্য

লেখক র. কিতাবের ভূমিকায় বলেন, বর্তমানে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরীকাসমূহের পরিবর্তে বিজাতীয় আচার-আচরণের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ব্যাপকতর হতে দেখা যাচ্ছে। মুসলমানগণ দীনের শিক্ষা ভুলে গিয়ে বদদীনী তরীকা গ্রহণ করতে শুরু করেছে, তখন তাদেরকে ইসলামী জীবনাচরণ ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের কথা বেশি করে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা মুসলমানদের দুনিয়া-আখেরাতের সকল কল্যাণ ও মুক্তি একমাত্র সুন্নাতের উপর আমল করার মধ্যেই নিহিত।

এ উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল থেকে এমন একখানা সহজ-সরল কিতাব সংকলন করার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যার দ্বারা মুসলিম জনগণকে সুন্নাতের অনুপম তরীকা সম্পর্কে অবহিত করা সম্ভব হবে। যেন এর দ্বারা তারা অতিসহজে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করার সহজ-সরল পন্থা অবলম্বন করতে সমর্থ্য হন। অন্তরের এ উদ্বেলিত আকাঙ্ক্ষাই আমাকে কিতাবখানা সংকলনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মনীষীদের মন্তব্য

হযরত মুফতী শফী রহ. বলেন, আমার মুহতারাম বুযুর্গ, হযরত থানবী রহ. এর সুযোগ্য খলীফা আরেফ বিল্লাহ ডা. আব্দুল হাই আরেফী সাহেব সম্প্রতি সাধারণ মানুষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও সুন্নাতে রাসূলের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করানোর লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ সংলকন করেছেন, যা প্রকৃতপক্ষে সীরাত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের মূল উদ্দেশ্যে। ...আলহামদুলিল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম চরিত সম্পর্কিত এ মূল্যবান গ্রন্থখানা সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সংকলিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত লেখককে এর প্রতিদান প্রদান করুন এবং কিতাবটি কবুল করে পাঠকদের জন্য তা উপকারী করুন। আমীন।

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. একপত্রে লেখেন, অধম (যাকারিয়া রহ.) জনাব ডা. আব্দুল হাই সাহেবের লিখিত কিতাব উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে হজ্জ-উমরার নিয়তে আগত বিপুল সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে পড়িয়ে শুনিয়েছে। যেসব স্থানে কিছুটা সন্দেহ মনে হয়েছে সেগুলো বিজ্ঞ আলেমদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিতাবখানা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা এটি কবুল করুন এবং লেখকের জন্য সদকায়ে জারিয়ার উসীলা করে দিন। আমীন।

বৈশিষ্ট্যাবলী

উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখকের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় একটি রচনা। কিতাবটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। এটাই এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্য। ফলে একজন মানুষ যদি রাসূলে আকরাম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে চায় তাহলে তার জন্য এই একটি বইই যথেষ্ট হবে।

এ কিতারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, গ্রন্থকারের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়েছে বলেই বোধহয় উর্দূ ভাষায় এর কয়েক লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়ে আগ্রহী পাঠকগণের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে এবং করছে।

তাছাড়া বইয়ের লেখক একজন শীর্ষস্থানীয় আল্লাহর ওলী হওয়ায় এর প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে তার হৃদয়ের আবেগ ও আন্তরিক দু'আর মিশ্রণ রয়েছে। এ-ই কারণ যে, এর প্রতিটি কথা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং স্থায়ী দাগ কেটে যায়।

অনুবাদ

এ পর্যন্ত আরবী, ফারসী, হিন্দী, গুজরাটী, বাংলা, ইংরেজি ও ফ্রেন্স-সহ পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে এবং স্ব-স্ব ভাষাভাষীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

বাংলা অনুবাদ ও অনুবাদক

লেখক রহ. নিজেই বিশিষ্ট আলেমে দীন, মাসিক মদিনা-র সম্পাদক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবকে এর বাংলা অনুবাদ করার নির্দেশ দেন এবং শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব, মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব, মাওলানা সুবহান মাহমূদ সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অনুবাদের কাজ ত্বরান্বিত করতে বিশেষ তাগিদ দেন। মাওলানা খান সাহেব তার বিশিষ্ট বন্ধু মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে অনুবাদের কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। অনুবাদটি মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের জানা মতে এটি বহুবার ছাপা হয়ে বাংলাভাষী পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণ করছে। আল্লাহ তা'আলা লেখক, অনুবাদক, পাঠকসহ সকলকে ভরপুর কবুল করুন। আমীন।

পুনশ্চ: বইটির অনুবাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব অনেকদিন ধরে খুবই অসুস্থ। পাঠকবৃন্দের কাছে তার পরিপূর্ণ সুস্থতার দু'আর আবেদন রইল।

গ্রন্থপঞ্জি

১. উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (বাংলা অনুবাদ)।
২. স্মৃতির মনীষীরা।
৩. প্রাচীন প্রদীপ।
৪. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী আওর উনকে খুলাফায়ে কেরাম।
৫. মাসিক আলকাউসার।

লেখক : মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

মাদরাসার ছাত্র ও উলামায়ে কেরামের জন্য সুখবর

জমি-জমার সমস্যা নিরসনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত, ঐতিহ্যবাহী 'ঢাকা হলি সার্ভে ট্রেনিং সেন্টার' রেজি. নং ৩৭২১৯-এর অধীনে শবে বরাত থেকে রমাযানের ২দিন পূর্ব পর্যন্ত ভূমি জরিপ প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, ঢাকা।
ডি.এম. ভবন (২য় তলা), বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রশিক্ষণ সময়কাল

১৬ শা'বান থেকে ২৮ শা'বান পর্যন্ত।

সার্টিফিকেট

ঢাকা হলি সার্ভে ট্রেনিং সেন্টার-এর পক্ষ হতে উত্তীর্ণদের মাঝে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ক্লাস উদ্বোধন করবেন

ঢাকা হলি সার্ভে ট্রেনিং সেন্টার এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, বেফাকের ভূমি জরিপ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের প্রধান পরিচালক-

মুফতী মুহাম্মাদ উসমান গনী সাহেব দা.বা.
মুহাদ্দিস, কল্যাণপুর মাদরাসা, ঢাকা।

ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে কল করুন
মাওলানা মাহমূদুল হাসান
০১৯২৭৩২৪৬৪৭, ০১৮৬৪৩৩১৯১৬

আবেগপ্রবণ বাঙালীর তীর্থস্থান মাজার-দরগা-২

মাওলানা হাফিজুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাজার চর্চার সুরতহাল

মানুষের কর্ম তার চিন্তা চেতনার প্রতিবিম্ব। চেতনা বিশ্বাসে খাদ তৈরি হলে তা থেকে বিকলাঙ্গ কর্ম সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য, আপন চেতনাকে যাবতীয় অজ্ঞতা ও প্রান্তিকতা থেকে সমুন্নত রাখা। মুমিনের চেতনাবোধ স্বচ্ছ সুন্দর এবং আবিলতা মুক্ত রাখতে তাকে সজাগ প্রহরীর ভূমিকা রাখতে হয়। বিকলাঙ্গ চিন্তা চেতনা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই সমাজে নানা রকম কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। শিরক বিদআত হল, সমাজের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি ও কুসংস্কার। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে এসব অনাচারের প্রাবল্য ঘটে। সুতরাং সুস্থ চেতনাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে যাবতীয় মিথ্যা বিশ্বাস ও অসুস্থ চেতনার সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিতে হয়। কোনো ব্যক্তি, বস্তু কিংবা কোনো স্থান বা কাল সম্বন্ধে অলীক বিশ্বাস পোষণ করার সুযোগ ইসলামে নেই। তদ্রূপ কল্পনাপ্রসূত কোনো ধারণাকে কেন্দ্র করে ভক্তি নিবদনে সীমা লঙ্ঘনের সুযোগও ইসলামী শরীয়তে রাখা হয়নি। পবিত্র কুরআনে যেমন সত্যবিমুখ অবিশ্বাসীদের মর্মন্তুদ পরিণামের কথা বিবৃত হয়েছে তেমনই ধর্মের নামে ভিত্তিহীন কর্ম ও বিশ্বাসের প্রচারণাকারীদেরকে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মাজারকেন্দ্রিক যেসব অনাচার আমাদের সমাজে সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই রিপুতাড়িত কর্মযজ্ঞ। নারী-পুরুষের বাঁধভাঙ্গা সংসর্গ, উন্মাতাল গান-বাদ্য, মদ-জুয়া ও গাঁজার আসর ইত্যাদি অবৈধ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড মাজারকেন্দ্রিক পূজা-অর্চনার অন্যতম অনুষঙ্গ। **দ্বিতীয়ত:** মাজারকেন্দ্রিক আয়োজনকে কেন্দ্র করে চলে সিন্ডিকেট গ্রুপের কমার্শিয়াল আয়োজন। তারা বৈষয়িক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাজারে আগত নারী পুরুষের দান-দক্ষিণা, নজর-মান্নত হাতিয়ে নেয়। তারা ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচের জমজমাট বাণিজ্যের হাট বসায়। **তৃতীয়ত:** মাজারকে কেন্দ্র করে চলে শিরক বিদআতের রমরমা আয়োজন। মাজারের মাটিতে শায়িত ব্যক্তিকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী, কামনা-বাসনা পূরণকারী এবং বিপদাপদে উদ্ধারকারী জ্ঞান করে তাকে খোদার আসনে সমাসীন করে দেয়। চিন্তাগত এসব শিরকী ধারণাকে পুঁজি করে শায়িত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও মান্নত মানা, সেজদায় লুটিয়ে পড়া, পশু বলি দেয়া, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুস্থতা ও স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করাসহ হাজারো রকমের কর্মগত শিরকের অনুশীলন হয়। **চতুর্থত:** সেখানে এক শ্রেণীর টুপি-শ্মশ্রুধারী গুরু কর্তৃক কুরআন-সুন্নাহ এবং দীন-ইসলামের বিকৃতি সাধনের কর্ম সাধন করা হয়। তারা মাজারকেন্দ্রিক যাবতীয় কার্যকলাপের স্বপক্ষে সাম্প্রদায়িক জেদ ও হঠকারিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা রকমের কল্পিত ধারণা প্রচার করে থাকে এবং দ্বিধাহীনভাবে কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যায় মত্ত থাকে।

মাজারপূজার সঙ্গে মূর্তিপূজার সাদৃশ্য

মাজারপূজার সঙ্গে মূর্তিপূজার সাদৃশ্য বেশ গভীর। কারণ-

১. আজকের সনাতন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের মূর্তিকে কেন্দ্র করে বড় আকারে বাৎসরিক এক দু'টি উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

২. তারা নিয়মিত তাদের মূর্তির সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে।

৩. মূর্তিকে কেন্দ্র করে তারা মান্নত বা পশু বলি দিয়ে থাকে।

৪. মূর্তির সম্মুখে তারা মাথা নত করে।

অনুরূপ মাজারপন্থী ভাইয়েরাও-

১. তাদের মাজারকে কেন্দ্র করে বেশ ঘটা করে বছরে এক-দু'বার ওরস উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

২. তারা তাদের মাজারে মোমবাতি, আগর বাতি থেকে শুরু করে মাজারস্থ ব্যক্তির সামনে নানা রকম ইলেকট্রিক বাতি জ্বালিয়ে থাকে।

৩. তারা তাদের মাজারকে কেন্দ্র করে নিয়াজ করে থাকে।

৪. তারা তাদের মাজারের সম্মুখে মাথা নত করে, মাজারের চৌকাঠে চুমু খায়।

আর কিছু না হোক মূর্তিপূজার সাথে এ সাদৃশ্যগুলোই তো মাজারপূজা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ মাজারকেন্দ্রিক কীর্তিকলাপ নিষিদ্ধ হওয়ার অগণিত তথ্যসূত্র ও প্রমাণপঞ্জি কুরআন সুন্নাহ এবং ফিকহের গ্রন্থগুলোতে নানা আঙ্গিকে বিবৃত হয়েছে।

মাজার তাপসদের অভিসন্দর্ভ 'জাআল হাক্ব'

অপরাধ করে যদি তার সপক্ষে যুক্তির পাণ্ডিত্য ঝাড়া হয় তখন তাকে বলা হয় চুরির উপর সিনা জুরি। অর্থাৎ তাস্কর্যের গর্হিত অপরাধ সম্পাদন করে আবার বীরত্ব প্রদর্শনী! কারো হৃদয়ে যদি কবর বিষয়ে সত্য গ্রহণের সদিচ্ছা থাকে এবং সে ইচ্ছা বাস্তবায়নে এতদ্‌সংক্রান্ত হাদীসে রাসূলের মূলপাঠগুলো উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ করে তবে সে আদৌ কবর বা মাজার বিষয়ক বাড়াবাড়ি বা প্রান্তিক আচরণে লিপ্ত হতে পারে না। পৃথিবীতে দীনে ইসলামের যতগুলো বর্জিত শাখা রয়েছে সকল শাখার ধারক বাহকগণ কুরআন হাদীসের মাধ্যমেই তাদের বিভ্রান্তি প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। এ পৃথিবীতে কোনো মতবাদ দাঁড় করাতে হলে যুক্তি কুযুক্তির কোনো অভাব হয় না। কিন্তু বাঁকা পথে যুক্তির খোঁজ করে কোনো জিনিস প্রতিষ্ঠিত করে আর যা-ই হোক রাব্বুল আলামীনের সমীপে গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি লাভ করা যায় না। মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী। দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আমরা উদারতার বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থখানা পাঠে উপলব্ধ হবে, মানুষ কি করে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের মাধ্যমেও বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। তিনি গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'জাআল হাক্ব'। মানে সত্য এসেছে। শিরক-বিদআতের প্রতিষ্ঠা কি সত্য প্রতিষ্ঠা? তবে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন আইম্মায়ে আসলাফ কবরের উপর স্থাপনা তৈরি করতে নিষেধ করে, তাতে আলোকসজ্জা করতে বারণ করে, তাতে উৎসব করতে এবং তাকে সেজদার স্থল বানাতে নিষেধ করে (আল্লাহর আশ্রয় চাই) মিথ্যা ছড়িয়ে ছিলেন?! এখন সে মিথ্যাকে বিলুপ্ত করে লেখক প্রচলিত মাজারকেন্দ্রিক সত্য আনয়নে উদ্যত হলেন? গ্রন্থটি পাঠে উপলব্ধ হবে তাতে কি পরিমাণ সত্যের

অপলাপ করা হয়েছে, বিভিন্ন হাদীস এবং ফিকহের মূলপাঠের খণ্ডিত অংশ উদ্ধৃত করে শিরক বিদআত প্রতিষ্ঠা করার দুঃসাহস দেখানো হয়েছে। দীনে ইসলামের যাবতীয় ঝাল্লাত-জঞ্জালের সমাবেশ ঘটেছে গ্রন্থটিতে। বলা চলে এটি একটি জঞ্জাল-আবর্জনার সঞ্চয়পত্র কিংবা শিরক বিদআতের অভিসন্দর্ভ। এ গ্রন্থটি পাঠে কি পরিমাণ মানুষ যে তাদের শিরকী চেতনাকে শানিত করে নিচ্ছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। বিচার দিবসে কি নাঈমী সাহেব এত মানুষের অনাচারের দায়ভার বহন করতে পারবেন?

সবুজ গম্বুজের স্থাপনা প্রসঙ্গ

একটি কবর মাজারের স্বীকৃতি লাভ করে কখন? যখন কবরটির চারিধারে শক্ত দেয়ালের গাঁথুনি হবে, উপরে হৃদয়গ্রাহী স্থাপনা হবে, কবরের উপরের মাটিতে বালু-সিমেন্টের প্রলেপ পড়বে, ফ্যান বাতির সংযোজন হবে, মোম আগরের প্লাবন বইবে। এসব আবশ্যিক আয়োজনেই একটি নীরব নিস্তব্ধ কবর প্রকৃত মাজারের মর্যাদা (?) লাভ করে। মাজারের এসব আয়োজন প্রমাণে মাজার-উৎসাহী ভাইদের তথ্য-যুক্তির অভাব নেই। তাদের বুকের পাটা এতটাই মজবুত, তারা এসব প্রমাণে কুরআন হাদীস এবং ফিকহ-ফাতওয়ায় টুঁ দিতেও শিহরিত হন না। মাজারের উপর স্থাপনা তৈরির ব্যাপারে তাদের বড় যুক্তি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার উপরে সবুজ স্থাপনা রয়েছে। তার কবরের চারিধারসহ উপরস্থ ভূমিতে বালু-সিমেন্টের আস্তর রয়েছে এবং তার উপরে দামি কাপড়ের আচ্ছাদনও রয়েছে। এ যুক্তিতে তারা তাদের মাজার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করে চলেছে। প্রশ্ন হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরকেন্দ্রিক এ বাড়তি আয়োজন কে বা কারা করেছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নিজে করেছেন বা করতে বলেছেন? সাহাবায়ে কেরাম করেছেন? কোনো তাবেয়ী করেছেন? তাবে তাবেয়ী করেছেন? স্বর্ণ যুগের কেউ এসব করেননি। কবরকেন্দ্রিক এসব আয়োজনের ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল এব্যাপারে তাদের মন্তব্য শোনা যাক।

১. জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৮৯)

২. আবূ বুরদা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু মূসা আশআরী রা. মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি বলেছিলেন, ...এবং তোমরা আমার কবরের উপর কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করো না। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩১৫০)

৩. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী নারী, এবং কবরকে সেজদার স্থলে পরিণতকারী এবং তাতে বাতি প্রদানকারীর উপর অভিশম্পাত করেছেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩২৩৮)

৪. আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এবং আবু হুরাইরা রা. উভয়ই ওসিয়ত করে গেছেন, তাদের কবরে যেন শামিয়ান না টানানো হয়। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ; হা.নং ১১৮৭০, ১১৮৭১)

বর্তমানে যদিও দেখা যাচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের রওযা মুবারক মসজিদে নববীর মাঝে অবস্থিত। কিন্তু এমনটি সাহাবাদের যুগে ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামকে আয়েশা রাযি.-এর ঘরে কবরস্থ করেছিলেন যাতে পরবর্তীতে কেউ এ জায়গাকে সেজদার স্থলে পরিণত করতে না পারে। কিন্তু পরবর্তীতে যা সংঘটিত হয়েছে তা সাহাবায়ে কেরামের চিন্তায়ও আসে নি। ৮৮ হিজরীতে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক মসজিদে নববী সংস্কার এবং সম্প্রসারণের নির্দেশনা জারি করে। এ সম্প্রসারণের সময়ই রওযা মুবারক মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন বারণ করার মত কোনো সাহাবী মদীনা শরীফে জীবিত ছিলেন না। (ইসআদুল আখসা বিযিকরি সাহীহি ফাযাইলিশ শাম ওয়াল মাসজিদিল আকসা ২/৫৪)

অতঃপর উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. তার খিলাফতকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের রওযা প্রাচীরকে মসজিদের এক কোনায় সীমাবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। যাতে করে নামাজ আদায়ের সময় রওযা মুবারক কেবলার মত না হয়ে যায়। (আল ইসতিযকার ৮/২৪৪)

এরপর ৬৭৮ হিজরী সনে সুলতান মানসূর কালাউন সালেহী খিলাফতে সমাসীন হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুচি ও মনোবাসনার প্রতি কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের মনমতো রওযা মুবারকের উপর গম্বুজের স্থাপনা তৈরি করে দেন। (আল হাবী লিল ফাতাওয়ী লিস সুয়ূতী ৩/৪০)

বস্তুত অপ্রয়োজনীয় উঁচু স্থাপনা নির্মাণ ইসলামী শরীয়ার রুচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে নিরর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো? আর প্রাসাদ নির্মাণ করছো এ মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে। (সূরা শুআরা- ১২৮, ১২৯)

আলী রাযি. সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবুল হাইয়াজ আসাদী রাযি.কে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন আমি কি তোমাকে সে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ মর্মে প্রেরণ করেছিলেন যে, যেখানেই জীবচিত্র দেখবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে এবং যেখানেই উঁচু সমাধি দেখবে সমান করে ফেলবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯৬০)

প্রশ্ন হল তবে কেন আজো এসব বাড়তি সংযোজন যথাস্থানে বর্তমান আছে? এর উত্তর হল, বর্তমানে বাইতুল্লাহর যে অবকাঠামো আমরা দেখছি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনপূত অবকাঠামো ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছিলেন, বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে হাতীমে কাবাকে বাইতুল্লাহর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে দিতে। কিন্তু তিনি মানুষের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় কাবা সংস্কারের কাজে হাত দেননি। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কাবা সংস্কার করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোবাসনা পূরণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শাসক এসে সেটাকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা মনে করে কাবাকে ভেঙ্গে আবার পূর্বের মত করে নির্মাণ করে দেয়। অবস্থাদৃষ্টে উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করলেন, কাবা বর্তমানে যে অবকাঠামোতে আছে সে অবকাঠামোতেই থাকবে। তাতে কোনোরূপ সংযোজন বিয়োজন করা যাবে না এবং আল্লাহর ঘরকে রাজনৈতিক খেলনায় পরিণত করতে দেয়া যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় মুনাফেকদেরকে কাফের জেনেও হত্যা করতে বারণ করেছিলেন। সুতরাং রওযা মুবারকের উপর স্থাপনা নির্মাণ যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার পরিপন্থী কাজ কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াতে এবং মানুষের মধ্যে

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় রওযা মুবারকের উপর নির্মিত অবকাঠামোতে হাত দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো। (সূরা হাশর- ৭)
সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যা করতে বলেছেন আমাদেরকে তা-ই করতে হবে। আর যা কিছু থেকে তিনি বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযায় কে বা কারা কি করল না করল তা আমাদের জন্য দলীল নয় এবং সেগুলো দিয়ে দলীল দাঁড় করানোরও কোনো অবকাশ নেই।

শেষকথা

পরিশুদ্ধ জীবনচর্চাই হলো দীন-ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য। দীনের অশুদ্ধ অনুশীলনে ধর্মীয় জীবন সফলতার আলো দেখবে না। তাই দীনের নামে কোনো কিছু চর্চা করার আগে তার শুদ্ধতা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে। এটা বিবেকের অপরিহার্য দাবি। নতুবা অর্থ শ্রম সময় এবং অতি সাধের ঈমানসহ সবকিছুর সলিল সমাধি হবে। অন্তত এটা তো চির সত্য, মাজারমুখী না হলে আমাকে শেষ বিচারের দিনে এ নিয়ে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু মাজারচর্চায় অংশগ্রহণ করলে সৃষ্টিকর্তার (কাল্পনিক) তুষ্টি কিংবা ক্ষমাহীন প্রবল অসন্তোষ–এদুটির একটি অবশ্যই অবধারিত। কোনো বিবেকবান মানুষ এধরণের সুনিশ্চিত ঝুঁকির দিকে কখনো পা বাড়াতে পারে না। কোনো মৃত ব্যক্তির –চাই সে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারীই হোক না কেন– তার সমাধি আমাদের মুক্তির মাইলফলক হতে পারে না। আমাদের কি দায় পড়েছে যে, দেয়াল স্থাপনা দিয়ে কোনো সমাধিকে আজীবন কর্মমুখর এবং স্মৃতিময় রাখতে হবে? মৃত ব্যক্তির সম্মান দেখানোর ব্যাপারটি শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু আলোকসজ্জা, মস্তক অবনতিসহ বর্জিত নানা আচরণের মাধ্যমে যে সম্মান আমরা তাদেরকে প্রদান করে থাকি তাতে কি তারা সম্মানবোধ করেন, নাকি বেদনাহত হন? প্রশ্নগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ দীন চর্চার তাওফীক দান করুন।

লেখক : শিক্ষাসচিব, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বছিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(১২নং পৃষ্ঠার পর; সৎ জীবনে দারিদ্র্য)

এই অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী, অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইমাম গাযালী দীর্ঘজীবী হননি। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ৫০৫ হিজরী সনে ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি। তার অমূল্য গ্রন্থাবলীর তালিকায় আছে প্রায় আশি খানা কিতাব। এছাড়াও শিরোনামহীন বহু কিতাব রয়েছে। আল্লামা নববী রহ. বুস্তান নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইমাম গাযালী রহ. এর জীবনের সময়ের সাথে তার রচনাবলীর হিসেব করলে গড়ে প্রতিদিন ১৬ পৃষ্ঠা করে পড়ে। যা অত্যন্ত বিরল। কারণ তার সকল রচনাই হল মৌলিক ভিত্তিমূলক। নিজ উদ্ভাবিত রচনা। যাতে অন্যের কোন অনুসরণ নেই। (মুকাশাফাতুল কুলূব ৪/২৬)

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর জীবনে দরিদ্রতা

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর প্রকৃত নাম ইয়াকুব। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর একান্ত হাতে গড়া মানুষ এবং হানাফী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ ইমাম ও মুজতাহিদ। তিনি ১১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে অসচ্ছল থাকার কারণে তিনি প্রথম জীবনে ধোপার (কাপড় পরিস্কারের) কাজ করতেন। তার ছোটবেলায় একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. একাজ করতে দেখে ডেকে এনে নিজ শিক্ষার আসরে বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ধোপার কাজে কত টাকা উপার্জন কর? তিনি বললেন, দেড় টাকা। যা দিয়ে আমি ও আমার আম্মার খাবারের ব্যবস্থা হয়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তুমি এই ইলমের মজলিসে বসে ইলম শিক্ষা কর। তোমার সংসারের জন্য আমি তোমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেড়শ টাকা দিলাম। এভাবেই এ জগতবিখ্যাত ফকীহের পড়াশুনা শুরু হল। এরপর তার এই টাকা ফুরানোর পূর্বেই ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাকে টাকা দিয়ে দিতেন, যাতে তার সংসারে কষ্ট না হয়। ইলম থেকে তিনি বঞ্চিত না হন। কিন্তু একদিন তার আম্মা ছেলেকে কাজে না দেখে রাগ করে ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে বললেন, আপনি তো আমার ছেলেকে কাজ থেকে বিরত রেখে দিলেন, তাহলে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হবে কি? ইমাম সাহেব ধৈর্য্য সহকারে উত্তরে বললেন, আম্মাজান! একটু সবর করুন, তাকে ইলম শিক্ষার সুযোগ দিন, তাহলে সে একদিন পেস্তা বাদামের তেল দিয়ে পরোটা খাবে। বাস্তবে দেখা গেল তিনি বাদশাহ হারূনুর রশীদের শাসনামলে পুরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। আর বাদশাহ তার সম্মানে উক্ত খাবারের আয়োজন করেছিলেন।

মোটকথা, উচ্চশিক্ষা কিংবা উন্নত জীবনযাপনের জন্য বুযুর্গানে-দীনগণ কখনোই দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনকে অভিশাপ মনে করেননি। বরং এই অবস্থাকে নবীদের সুন্নাত মনে করে ধনাঢ্যতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা বিশ্বাস করতেন, দারিদ্র্যেই প্রাচুর্য এবং অভাবেই ঐশ্বর্য। তারা উপলব্ধি করেছিলেন, দয়ালু রবের রহমত অল্পে তুষ্ট অভাবীদেরই সঙ্গী হয়। ফলে দরিদ্র জীবন যাপনে স্বচ্ছল জীবনের তুলনায় নানা রকমের অস্থিরতা বা দুশ্চিন্তা এবং বিভিন্ন মনোমালিন্য ও তিক্ততা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সাধারণত অভাবী মুমিনের মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহমুখিতা বেশি থাকে। এই সবকিছুই হয় অভাবের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও দয়ার সম্মিলনে। এর বিপরীতে যাদের সামান্য প্রাচুর্যও স্পর্শ করে তাদের সুখ ও প্রশান্তি হ্রাস পেতে থাকে, মাধুর্য এবং ভালোবাসার সম্পর্কগুলোয় নানা কুধারণা ও অবিশ্বাস চিড় ধরাতে শুরু করে। সর্বোপরি দীনের প্রতি উন্নাসিকতা এবং আমলের প্রতি অনাগ্রহ বাড়তে থাকে। আর যদি দুর্বল ঈমানদারের জীবনে ঐশ্বর্যের ছোঁয়া লেগে যায় তাহলে অধঃপতন ও অস্থিরতার প্লাবনে যেন সে হারিয়ে যায়। এমনকি দীনকে তার কাছে মনে হয় আফিমের মতো। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে সে পরাধীনতার শেকল মনে করে বসে। এই কঠিন বাস্তবতার চিত্রায়নে মানুষ প্রবাদও তৈরি করে ফেলেছে - Money is the root of all evils (অর্থই সকল অনর্থের মূল)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উভয় জাহানে সুখ ও প্রশান্তির জীবন দান করুন এবং সবধরনের অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষা সচিব, আল জামি'আ মদীনাতুল উলূম মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা, শিকদার মেডিকেল ডেন্টাল কলেজ রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা। ইমাম ও খতীব, পুলপাড় জামে মসজিদ, জাফরাবাদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিনতে আলতাফ হুসাইন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৬৩ প্রশ্ন : (ক) আয়েশার কাছে ফাতেমার কিছু টাকা পাওনা ছিল। আয়েশা ফাতেমার টাকা পরিশোধ করার আগেই ফাতেমা মারা যায়। ফাতেমার ওয়ারিস, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কারো সাথেই আয়েশার পরিচয় নেই। এখন আয়েশা ফাতেমার টাকা কিভাবে পরিশোধ করবে?

(খ) এক বক্তাকে বলতে শোনা গেল, ৪টি জিনিস অসীম। আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম ও মানুষ। এই কথাটি ঠিক কিনা? মানুষ কিভাবে অসীম হতে পারে?

(গ) দুরূদে তুনাজ্জিনা/নাজিয়া, দুরূদে নারিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দুরূদ শরীফ যেগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং বুযুর্গানে দীনের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলো পড়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর : (ক) প্রশ্নোক্ত সূরতে ফাতেমার টাকা পরিশোধ করার জন্য তার কোন ওয়ারিসকে খোঁজ করা আয়েশার জন্য আবশ্যক। যদি কোন ওয়ারিসের সন্ধান মেলে তবে তাকে আদায় করে দিবে। আর সাধ্যানুযায়ী খোঁজ করার পরেও যদি কোন ওয়ারিসের সন্ধান না মেলে তাহলে সন্ধান পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করতে থাকবে। যদি নিরাশ হয়ে যায় তাহলে আয়েশা সেই টাকা ফাতেমার নামে মিসকীনদেরকে সদকা করে দিবে। কিন্তু পরবর্তীতে যদি কোন ওয়ারিস পাওয়া যায় এবং সে আয়েশার সদকা করাকে মেনে নেয় তবে তো তার ঋণ আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় পুনরায় তাকে পূর্ণ টাকা আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে সদকার সওয়াব আয়েশা পাবে। (মাজমাউয যিমানাত; পৃষ্ঠা ৭৭৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৩৯০, ইমদাদুল আহকাম ৩/৬২৬)

(খ) বক্তার এই কথা সঠিক নয়। কেননা অসীমের মূল অর্থ হল, সীমাহীন, যার কোন সীমা নেই। আর সীমাহীন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। পক্ষান্তরে জান্নাত, জাহান্নাম ও মানুষ আল্লাহ তা'আলার মাখলুক যা কিছুতেই সীমাহীন হতে পারে না। আর অসীমের অর্থ যদি তিনি চিরস্থায়ী বা অশেষ বুঝিয়ে থাকেন তাহলে আরশ, কুরসী, ফেরেশতা, জীন এগুলোও তো স্থায়ী হতে পারে। নির্দিষ্ট করে ৪টি জিনিস বলা তো অযৌক্তিক। (সূরা নিসা- , আকীদাতুত ত্বহাবী; পৃষ্ঠা ৬৫, মা'আরিফুল কুরআন ৩/৪০৮)

(গ) দুরূদে তুনাজ্জিনা, নারিয়া ইত্যাদি দুরূদ শরীফ যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় যদি তা শুধু দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে, কোন ধরনের বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ, কোন হকপন্থী আলেম, বুযুর্গ পড়তে দেন তাহলে তা কোন রকমের শরীয়ত কর্তৃক হুকুম প্রমাণিত হওয়ার আকীদা বিশ্বাস না রাখার শর্তে এবং দুরূদগুলোর সাথে শরীয়ত বিরোধী কোন শব্দ যোগ করা না হলে তা পড়া জায়েয আছে। অন্যথায় পড়া জায়েয নেই।
(ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৮২, ৮৩)

রাসেল হাবীব
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৬৪ প্রশ্ন : সম্মিলিত দু'আর কোন সুস্পষ্ট দলীল আছে কি? আর উক্ত দু'আ কি পাঁচবারই করা মুস্তাহাব?

উত্তর : হ্যাঁ, সম্মিলিত দু'আর সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে এভাবে দু'আ করে যে, তাদের একজন দু'আ করতে থাকে আর অন্যেরা 'আমীন আমীন' বলতে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ অবশ্যই কবুল করে থাকেন। (কানযুল উম্মাল; হা.নং ৩৩৬৪)

এ ধরনের আরো বহু দলীল রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. কর্তৃক রচিত সম্মিলিত মুনাজাত বা ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া।

আর যেহেতু ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হয় এজন্য পাঁচ বারই দু'আ করা মুস্তাহাব। উল্লেখ্য, এই মুস্তাহাবকে মুস্তাহাবের স্তরেই রাখতে হবে। জরুরী মনে করলে বিদআতের পর্যায়ে চলে যাবে। (আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী; হা.নং ৩৫৩৬, আল-মুসতাদরাক লিল-হাকেম; হা.নং ৫৪৭৮, কানযুল উম্মাল; হা.নং ৩৩৬৪, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৫৭, জামিউল উসূল; হা.নং ৩৮৪৭)

মুহাম্মাদ বদরুদ্দোজা
মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা

১৬৫ প্রশ্ন : আমার কর্মস্থলে অধিকাংশ সহকর্মী লা-মাযহাবী এবং প্রধান কর্মকর্তা আল-আমীন মসজিদের খাস মুসল্লী। তিনি প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নামাযের তাগিদ দেন এবং তার চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত করেন। বর্তমানে আমার মসজিদে আসরের জামাআত ৫টায় পড়ি। কিন্তু অফিসে ৪টায় জামাআত হয়। আমাদের এম.ডি স্যার সুন্নাত তরীকায় চলেন। তাই আমি অথবা স্যার একজন ইমামতি করি। প্রথম দিকে আলাদা নামায পড়তাম। কিন্তু তিনি রাগ করেন এবং আমাকে ইমামতি করতে অনুরোধ করেন। এখন প্রশ্ন হল, আমি যে ৪টায় আসরের নামায পড়ি অথবা পড়াই এটা কি জায়েয হচ্ছে?

উত্তর : বিকাল ৪টায় বর্তমানে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় না। কাজেই বিকাল ৪টায় আসরের নামায পড়া বা পড়ানো কোনটাই জায়েয হবে না। বরং ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে নামায আদায় করতে হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা মুহাম্মাদপুর, ইকবাল রোডে অবস্থিত আল-আমীন মসজিদের অনুসারীরা লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের লোক। শরীয়তের বিধানমতে অমুজতাহিদ লোকের জন্য মুজতাহিদের অনুসরণ বাধ্যতামূলক। লা-মাযহাবীরা মুজতাহিদ না হওয়া সত্ত্বেও কোন মুজতাহিদকে অনুসরণ না করে মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করার কারণে চরম পর্যায়ের গোমরাহ। এ জাতীয় গোমরাহ লোকের কথায় নিজের সঠিক আমল ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। বিশেষ করে যেখানে নিয়মিতই এ কাজটি করতে হবে, এমন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা উচিত নয়। সুতরাং ওয়াক্তমত নামায পড়ার সুযোগ না পেলে আপনি বিকল্প চাকরী তালাশ করুন। বিকল্প চাকরীর পূর্ব পর্যন্ত সম্ভব হলে আলাদা নামায পড়ুন। আর সম্ভব না হলে বাধ্য হয়ে যে কয়দিন ওয়াক্তের পূর্বে পড়বেন সে নামাযগুলো ওয়াক্ত হলে পুনরায় পড়ে নিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জের সফরে মক্কা-মদীনার ইমামদের পিছনে যে আসরের নামায আগে পড়া হয় তা জায়েয আছে। কেননা তারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রয়োজনে এক

মাযহাবের লোকের জন্য অন্য মাযহাবের ইমামের ইকতিদা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে যারা লা-মাযহাবী এলাকায় সাময়িক সময়ের জন্য তাবলীগে যায় তাদের জন্যও দীনের খাতিরে সাময়িক সময়ের জন্য ফাসিকের ইকতিদা করা জায়েয। কিন্তু দুনিয়ার খাতিরে এবং নিয়মিত ফাসিকদের ইকতিদা করা মূলত দীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া, যা শরীয়তমতে জায়েয নয়।

(সূরা নিসা- ১০৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৫১, সহীহ বুখারী; হা.নং ৬২৯, ৭৫৩৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৬১৬, ই'লাউস সুনান ২/৪-৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫১, ফাতাওয়া শামী ১/৩৭০, আইসারুত তাফাসীর ৩/৩৯৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/৪৫-৪৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/৭৮)

আল-আমীন
গাংনী, মেহেরপুর

১৬৬ প্রশ্ন : তাবলীগ জামাআতের মারকায ঢাকা কাকরাইল মসজিদ থেকে ৬০, ৪০, ৩৫, ৩০, ২৫, ২০, ১৫, ১০, ৭ ও ৩ দিনের জন্য বিভিন্ন এলাকায় জামাআত পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে তাদের নামাযের হুকুম কি হবে? কিছু ভাই বলে থাকেন, যেহেতু তাবলীগের সাথীরা এক মহল্লায় ১৫ দিনের বেশি অবস্থান করে না বিধায় তারা সর্বদা মুসাফিরের নামায পড়বে। তাদের এ কথাটির বাস্তবতা কি? উল্লেখ্য, বর্তমানে মহল্লা, ইউনিয়ন, গ্রাম, পৌরসভা, থানা ও জেলার ঐ সীমানা কতটুকু যা অতিক্রম করলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর : কাকরাইল থেকে যে জামাআত একই শহরের মধ্যে ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি দিনের জন্য পাঠায় তারা সে শহরে মুকীম হয়ে যাবে। আর ১৫ দিনের কমের নিয়ত করলে মুসাফির থাকবে যদি নিজস্ব স্থায়ী অবস্থান থেকে সফরের দূরত্বে হয়। আর শহর ছাড়া যেখানেই জামাআত পাঠানো হোক সেখানে শুধু গ্রাম ধর্তব্য হবে। থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ইত্যাদি ধর্তব্য হবে না। সুতরাং কোন তাবলীগ জামাআত যদি নিজ এলাকা হতে ৭৮ কি.মি. দূরের কোন গ্রামে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত করে তাহলে তারা মুসাফির থাকবে। আর ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকার নিয়ত করলে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে।

ঢাকা শহর, জেলা শহর ও গ্রামের আবাদী ধারাবাহিকভাবে যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্ত এলাকা শহর বা গ্রামের মধ্যে গণ্য হবে। তবে মাঝখানে যদি কোন কৃষিক্ষেত থাকে অথবা ১৩৭.১৬ মিটারের বেশি খালি জায়গা থাকে কিংবা বড় নৌকা চলাচলযোগ্য খাল থাকে তাহলে সেখান থেকে অন্য শহর বা অন্য গ্রাম ধরা হবে।

উল্লিখিত দূরত্ব যদি কোন এক শহরের মধ্যে বা এক গ্রামের মধ্যে হয় তাহলেও সফরের ক্ষেত্রে ভিন্ন শহর বা ভিন্ন গ্রাম ধরা হবে। তবে যদি উল্লিখিত দূরত্ব এমন দুই মহল্লায় হয় যে দুই মহল্লা কোন দিক দিয়ে সংযোগের কারণে এক শহরের আওতাভুক্ত তখন এই দুই মহল্লাকে একই ধরা হবে।

বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী গাবতলীর দিকে আমীনবাজার ব্রিজ পর্যন্ত, যাত্রাবাড়ির দিকে রায়েরবাগ পর্যন্ত, উত্তরার দিকে টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত আর দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার পাড় পর্যন্ত ঢাকা শহরের মধ্যে গণ্য হবে। অতএব সফরে যাওয়ার সময় এই স্থানগুলো অতিক্রম না করা পর্যন্ত কসর পড়া যাবে না। তদ্রূপ ঢাকার আসার সময় ঐ স্থানগুলোতে পৌঁছলেই মুকীম হয়ে যাবে। এমনিভাবে জেলা শহর বা গ্রামের একই হুকুম।

মুসাফিরের করণীয় : সে কসর তথা চার রাকাআতওয়ালা নামায নিজেরা পড়লে দুই রাকাআত পড়বে। তাড়াহুড়া বা ভয়ের সূরতে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়া জরুরী নয়। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় সকল নামাযের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়া যথারীতি সুন্নাত হবে।

মুকীমের করণীয় : সে সকল নামায তার সুন্নাতসহ পুরোপুরিভাবে আদায় করবে।

(ফাতাওয়া শামী ২/১২১-১২৩, ১২৫-১২৬, ১৩১, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৩৯, আল-বাহরুর রায়িক ২/২২৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৭৩)

হাফেয মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৬৭ প্রশ্ন : (ক) গৃহপালিত প্রাণী খাসী করা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি?

(খ) খাসীকৃত প্রাণী দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে কিনা?

উল্লেখ্য, জনৈক আকবর আলী রেজভী এ মর্মে ফতওয়া প্রদান করেছে যে, মানুষ ও পশুকে খাসী করা হারাম। এ নিয়ে সমাজে মারাত্মক ফেতনা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে শরয়ী সমাধান কামনা করছি।

উত্তর : (ক) গৃহপালিত প্রাণীকে খাসী করা জায়েয আছে। লিফলেটের ফতওয়াটি কোন মূর্খ কর্তৃক লিখিত এবং আরেক মূর্খের দ্বারা সমর্থিত। তাদের পড়ালেখার যোগ্যতা থাকলে তাদেরকে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো পড়ে নিতে বলবেন।

(ফাতাওয়া শামী ৬/৩৮৮, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ১৯/১২২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/২০৮, আল-মুহীতুল বুরহানী ৬/১২০)

(খ) খাসীকৃত প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাসীকৃত প্রাণী দ্বারা কুরবানী করেছেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি খাসীকৃত সাদা-কালো রং বিশিষ্ট মেষ দ্বারা কুরবানী করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৩৮৬০)

এছাড়াও একই অর্থের আরো অনেক হাদীস সহীহ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলোর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল।

(মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল; হা.নং ২৩৮৬০, মাজমাউয যাওয়াইদ; হা.নং ৫৯৬৬, আল-ইসতিযকার; হা.নং ৫/২২১, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ১৯/১২৫, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৩২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/২৬৩)

উল্লেখ্য, জনাব রেজভী সাহেব রূহুল বয়ান কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে যা বলেছেন, তা রূহুল বয়ানের আলোচনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রূহুল বয়ানের আলোচনা হল, (অর্থ) হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামে খাসী করা ও গীর্জা বানানোর অবকাশ নেই। হাদীসে খাসী করার দ্বারা মানুষের খাসী করা উদ্দেশ্য। সুতরাং পশুকে খাসী করা জায়েয আছে। আর এ কারণে আমরা বলি, যেমনিভাবে গোশতের প্রয়োজনে গবাদি পশু জবাই করা জায়েয, তেমনিভাবে মানুষের উপকারার্থে গবাদি পশুকে খাসী করাও জায়েয। (রূহুল বায়ান ২/৪০৪, সূরা মায়িদা- ৫৪)

আলহাজ্জ নূর হুসাইন
মুহাম্মাদিয়া হাউজিং লি., মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৬৮ প্রশ্ন : এক ব্যক্তি থেকে আমি দুই লক্ষ টাকা এই শর্তে নিয়েছি যে, এ টাকা বাবদ নির্দিষ্ট হারে কোন সুদ দিব না। তবে যে কয় মাস আমার কাছে থাকবে ঐ কয় মাস আমার মালিকানাধীন ঘরের একটি রুমের ভাড়া তিনি নিবেন। দুই লক্ষ টাকায় যে পরিমাণ সুদ আসে রুম ভাড়া তার চেয়ে কম-বেশি হতে পারে। আমার জানার বিষয় হল, উক্ত লেনদেন

সুদী কারবারের আওতায় পড়বে কি না? আর যদি পড়ে তাহলে এখন বাঁচার উপায় কি?

উত্তর : শরীয়তের মূলনীতি হল, ঋণদাতার ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণ বাবদ কোন ধরনের উপকার বা লাভ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। আর যদি ঋণ দিয়ে কোন ধরনের শর্তারোপ করে সে শর্ত বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্নে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী ঋণদাতা আপনার মালিকানাধীন ঘরের ভাড়া গ্রহণ করে আপনার থেকে ঋণ বাবদ উপকৃত বা লাভবান হচ্ছে। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নাজায়েয, হারাম ও সুদ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত শর্ত অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

তাই আপনার করণীয় হল, প্রথমে উক্ত ব্যক্তিকে হারাম কাজ ও সুদের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে অবগত করে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা। তারপরও যদি সে বিরত না থাকে তাহলে যথাসম্ভব দ্রুত তাকে উক্ত দুই লক্ষ টাকা ফেরত দিয়ে তার সাথে এ চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলা।

(সূরা বাকারা- ২৭৫, আল-জামিউস সগীর; হা.নং ৯৭২৮, বাদায়িউস সানায়ে ১০/৫৯৬, ফাতাওয়া শামী ৫/১৬৬, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহ ৫/৩৭৯৬)

মুহাম্মাদ সাকিব
মোমেনশাহী

১৬৯ প্রশ্ন : (ক) জনৈক মহিলা আয়েছা (বয়সজনিত ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার শিকার) নয়। তার বয়স ৩২/৩৩ বছর। কিন্তু ২/৩ বছর যাবত তার ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সে তিন তালাক প্রাপ্তা হয়েছে। এ মুহূর্তে সে কিভাবে ইদ্দত পালন করবে? হায়েয দ্বারা, নাকি মাস দ্বারা? যদি হায়েয দ্বারা হয় তাহলে এর পদ্ধতি কি হবে?

(খ) আমাদের দেশে প্রচলিত বিবাহ-শাদীতে বিবাহের দিন বর তার হবু স্ত্রীর জন্য শাড়ী-কাপড়, অলঙ্কার, কসমেটিক্স ইত্যাদি অনেক কিছুই নিয়ে থাকে। এসব বস্তু থেকে কোনগুলো মহর হিসেবে গণ্য করা যাবে? আর কোনগুলো মহর হিসেবে গণ্য করা যাবে না?

উত্তর : (ক) প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে উক্ত মহিলা অভিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসার মাধ্যমে ঋতুস্রাব জারি করার চেষ্টা করবে। চিকিৎসায় ঋতুস্রাব জারি হয়ে গেলে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণ তিন ঋতু ইদ্দত পালন করবে। অন্যথায় তালাকের পর থেকে ত্রিশ দিনে এক মাস হিসেবে পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালন করবে। তবে এর মধ্যে হায়েয দেখা গেলে তিন হায়েয হিসেবে ইদ্দত পালন করতে হবে।

(ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৫/২৩০, আল-বাহরুর রায়িক ৪/২২০, ফাতাওয়া শামী ৩/৫০৮-৫০৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৪৯০, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪৩৫)

(খ) স্বামীর উপর স্ত্রীকে যা দেয়া আবশ্যক যেমন খোরপোষ, বাসস্থান ইত্যাদি এগুলো মহর হিসেবে ধরা যাবে না। আর যে সমস্ত জিনিস স্ত্রীকে দেয়া স্বামীর জন্য আবশ্যক নয় সেগুলো মহর হিসেবে ধরা যাবে।

অতএব বিয়ের সময় প্রদত্ত অলঙ্কারাদি ও বেশি মূল্যবান কাপড় যা সাধারণত পরিধান করা হয় না এবং যেগুলো খোরপোষ হিসেবে আবশ্যক নয় তা মহর হিসেবে ধরা যাবে। আর সাধারণ কাপড়-চোপড় যা সব সময় কিংবা মাঝে মধ্যে পরিধান করা হয় এবং স্বামীর জন্য এমনিতেই তা দেয়া আবশ্যক সেগুলো মহর হিসেবে ধরা যাবে না। আর সমাজের প্রচলন হিসেবে প্রসাধনী সামগ্রী মহর হিসেবে ধরা যাবে না।

(ফাতাওয়া কাযীখান ১/২৩৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/৩২, আল-মুহীতুল বুরহানী ৪/১২৩, ইসলামী শাদী; পৃষ্ঠা ১৪৪)

বিনতে আব্দুল হাই
কাটলী, নেত্রকোণা

১৭০ প্রশ্ন : (ক) জনৈক আলেম বক্তা তার বয়ানে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন, لو لاك ما خلقت الأفلاك

(খ) তিনি আরো বলেন, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين এখানে نور দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি।

প্রশ্ন হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উক্ত আলেমের বক্তব্য কি সঠিক?

উত্তর : (ক) উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা, মিথ্যুকদের বানানো কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

(তাযকিরাতুল মউযূআত; পৃষ্ঠা ৮৬, আল-মউযূআতুল কুবরা; পৃষ্ঠা ১৯৪, কাশফুল খাফা ২/১৪৮, আল-মাসনূ'; পৃষ্ঠা ১৫০, আল-লু'লুউল মারসূ'; পৃষ্ঠা ১৫৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/৭৯)

তবে যারা বলেন, এই বর্ণনা যদিও জাল কিন্তু এর মূল বিষয়বস্তু (তথা আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতিরেই এই দুনিয়া পয়দা করেছেন, তাকে পয়দা না করলে তিনি কিছুই সৃষ্টি করতেন না) সঠিক- এটিও জাল হাদীসের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা কেন এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন তা ওহী ছাড়া জানা সম্ভব নয়। আর ওহী কেবল কুরআন-হাদীসেই সীমাবদ্ধ। আর কুরআন-হাদীসের কোথাও এ ধরনের কিছু উল্লেখ নেই। বিধায় এ জাতীয় আকীদা পোষণ করা যাবে না।

(আল-আহাদীসুল মউযূআতুর রা-ইজা; পৃষ্ঠা ৮৬, কাশফুল মউযূআত; পৃষ্ঠা ১৪৭)

(খ) উক্ত আলেমের قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين আয়াতের উপর ভিত্তি করে রাসূলকে নূরের তৈরি সাব্যস্ত করা ভিত্তিহীন কথা। কেননা এক হল, রাসূলকে নূর বলা, আরেক হল, রাসূল নূরের সৃষ্টি হওয়া। দু'টি আলাদা বিষয়। এই আয়াতে যে নূর বলা হয়েছে তার অর্থ তিনি জগতবাসীর জন্য পথ প্রদর্শক; তার অর্থ 'তিনি নূরের তৈরি' এমন নয়।

মুফাসসিরগণের ভাষ্য অনুযায়ী আয়াতে বর্ণিত নূর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল হিদায়াতের নূর যা নিয়ে তিনি দুনিয়াতে আগমন করেছেন এবং মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। যার সম্পর্ক কলব তথা আত্মার সাথে; বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে নয়। সূরা আ'রাফের ১৫৭নং আয়াত মুফাসসিরীনগণের উক্ত ব্যাখ্যা শতভাগ সত্যায়ন করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ : সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে সম্মান করবে, তাঁর সাহায্য করবে এবং তাঁর সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে তারাই হবে সফলকাম।

তাছাড়া সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত দু'আটি বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি তাহাজ্জুদের সময় করতেন-

اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى سمعى نورا، وفى بصرى نورا، وعن يمينى نورا، وعن شمالى نورا، وامامى نورا، وفوقى نورا، وتحتى نورا، واجعل فى نفسى نورا واجعلنى نورا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার জিহ্বায় নূর দান করুন, আমার কানে নূর দান করুন, আমার চোখে নূর দান করুন, আমার ডানে নূর দান করুন, আমার বামে নূর দান করুন। আমার সামনে নূর দান করুন, আমার পিছনে নূর দান করুন, আমার উপরে নূর দান করুন, আমার নিচে নূর দান করুন, আমার ভিতরে নূর দান করুন এবং আমাকেই নূর বানিয়ে দেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৩১৬, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৬৩)

উক্ত দু'আয় নূর দ্বারা বাতেনী (অদৃশ্য) নূর উদ্দেশ্য। যেমনটি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার কাযী ইয়ায রহ. লিখেছেন,

ومعنى النور هنا بيان الحق والهداية اليه.

অর্থ : এখানে নূর বলতে সত্যের প্রকাশ এবং এর প্রতি হিদায়াত ও পথ প্রদর্শন বুঝানো হয়েছে। (ইকমালুল মু'লিম ৩/১২৫)

দ্বিতীয়ত তিনি যদি নূরের তৈরি হতেন তাহলে واجعلنى نورا (আমাকেই নূর বানিয়ে দিন) বলার কী অর্থ!

তাছাড়া অনেক মুফাসসির যখন উক্ত আয়াতে নূর বলতে কুরআন বা ইসলাম উদ্দেশ্য নিয়েছেন তখন স্বয়ং রাসূলকে নূরের সৃষ্টি সাব্যস্ত করা যে বাতিল তা তো বলাই বাহুল্য।

উপরন্তু কুরআন-হাদীস এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তিনি মানব ছিলেন। আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে, সৃষ্টিকর্তা আদি পিতা আদম আ. কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার বংশধরের (যার মধ্যে নবী-ওলীগণও রয়েছেন) প্রত্যেককেই একফোঁটা পানি থেকে পয়দা করেছেন। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিও অনুরূপ হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হল-

এক.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

অর্থ : বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী আসে এই মর্মে যে, তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ। (সূরা কাহাফ- ১১০)

দুই.

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا.

অর্থ : বলুন, পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা। আমি একজন মানব রাসূল মাত্র। লোকদের নিকট হিদায়াত আসার পর তাদেরকে এই উক্তি ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?' বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতা বিচরণ করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতা রাসূল প্রেরণ করতাম। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৯৩-৯৫)

এই আয়াত তো মক্কার কাফেরদের যে আপত্তি ছিল (তিনি মানুষ হয়ে কিভাবে রাসূল হন) তা দূর করার জন্য অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে তো বলা হয়নি যে, তিনি তোমাদের মত মানুষ নন; বরং ফেরেশতাদের মত নূরের সৃষ্টি।

তিন.

عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما انا بشر.

অর্থ : হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি তো একজন মানুষ মাত্র। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬০২)

আর মানব সৃষ্টির ব্যাপারে কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াত-

এক.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ.

অর্থ : যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা সোয়াদ- ৭১)

দুই.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.

অর্থ : আর আপনার প্রভু যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি কাদামাটি থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানুষ তৈরি করব। (সূরা হিজর- ২৮)

তিন.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ.

অর্থ : আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর সে জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর সে গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। এরপর অস্থিকে গোশত দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। (সূরা মুমিনূন- ১২-১৪)

সারকথা, উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি মানব ছিলেন, বনী আদমের বংশধর ছিলেন। আর বনী আদম তথা মানব মাটির তৈরি। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাটির তৈরি একজন মানুষ। তবে আমাদের মত সাধারণ মানুষ নয়; বরং রাসূলের ভাষায়,

انا سيد ولد آدم ولا فخر!

অর্থ : গর্বের কিছু নয়, আমি বনী আদমের সরদার।

আর বনী আদম হওয়ায় রাসূলের সম্মান কমেনি; বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। কুরআনের ভাষায়,

ولقد كرمنا بنى آدم.

অর্থ : আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭১)

উল্লেখ্য, আশরাফুল মাখলুকাত বনী আদম যদি মাটির তৈরি হয়, লক্ষাধিক আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যদি মাটির তৈরি হন, আর স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানাদি যদি মাটির তৈরি হন, তাহলে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরে মুজাস্সাম বলার কী যুক্তি? এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করলেই বিবেকবানদের কাছে এর অসারতা বুঝে আসবে।

(কাশফু শিহাবুস সূফিয়্যা ১/২০৪, মা'আনিল কুরআন ওয়াই'রাবুহ ২/১১১, তাফসীরুল মাওয়ারদী ২/২২, তাফসীরুল বাগাবী ২/৩২)

বিনতে আলতাফ হুসাইন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৭১ প্রশ্ন : (ক) সুরমা কি বসে লাগানো সুন্নাত? সুরমা লাগানোর কোন দু'আ আছে কিনা? শুনেছি, সুরমা লাগানোর সময় এই দু'আটি পড়তে হয়-

ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير.

(খ) চুলা জ্বালানোর সময় কি কোন দু'আ পড়তে হয়? اللهم لا عيش الا عيش الآخرة এটা কি চুলা জ্বালানোর দু'আ?

উত্তর : (ক) সুরমা বসে বা দাঁড়িয়ে উভয়ভাবেই লাগানো যায়। হাদীসের বর্ণনায় বসে লাগানোর কোন শর্ত পাওয়া যায় না। সুরমা লাগানো তো সুন্নাত। বসে বা দাঁড়িয়ে যেভাবেই লাগাবে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে সুরমা বসে লাগালে ভালো। যেহেতু তখন স্থিরতার সাথে লাগানো যায়।

আর সুরমা লাগানোর বিশেষ কোন দু'আ নেই। অনুরূপ প্রশ্নোল্লিখিত দু'আটি

সুরমা লাগানোর দু'আ বলার কোন ভিত্তি নেই। বিসমিল্লাহ বলে লাগালেই হবে।
(সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৫, ৭১০, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮৮৩৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৪৯৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৩৪৭৬, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৬০৭২, ৬০৭৩, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ১০২৫৫, মউসূআতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যা ১০/৬৩২-৬৩৫)

(খ) চুলা জ্বালানোর সময়ও নির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। বিসমিল্লাহ বলে জ্বালালেই হবে। আর اللهم لا عيش الا عيش الآخرة এটি চুলা জ্বালানোর দু'আ হওয়ার কোন প্রমাণ আমাদের জানা নেই।
(সুনানে নাসায়ী; হা.নং ১০২৫৫, আর-রহীকুল মাখতূম; পৃষ্ঠা ২১৬, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৪/১০৪)

মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল

০০০ প্রশ্ন : বিশ্বের প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশই আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত হুকুম বাদ দিয়ে মানবরচিত সংবিধানের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। আমার প্রশ্ন হল, এভাবে তাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা تحكيم بغير شرع الله বলে গণ্য হবে কিনা? ইহুদীরা মাত্র একটি বিধান তথা যিনার শাস্তির ক্ষেত্রে তাওরাতের হুকুম ছেড়ে নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করার কারণে আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ নাযিল করেছেন। তাহলে যারা শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে সংবিধান তৈরি করেছে, তারা কি এর দ্বারা কুফরে আকবার থেকে বাঁচতে পারবে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত হুকুম বাদ দিয়ে মানবরচিত সংবিধানের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা গুনাহের কাজ। এর দ্বারা শাসকগণ ফাসেক হবে; কিন্তু কাফের হবে না। তবে যদি আল্লাহর নাযিলকৃত সংবিধানকে অচল মনে করে বা মানবরচিত বিধানকে তুলনামূলক ভালো মনে করে তাহলে তা কুফর হবে এবং শাসকগণ কাফের বলে গণ্য হবে। আর এটা শুধু শাসকবর্গের সাথেই সীমিত নয়; বরং এমন চিন্তাধারা যারাই পোষণ করবে তাদেরই ঈমান থাকবে না।
(তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/১১৮, তাফসীরে কুরতুবী ৬/১৯০, জামিউল বায়ান ১০/৩৫৮, তাফসীরুল মানার ৬/৩৩৫, রূহুল মা'আনী ৩/৩১৪, ফাতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন ৩/৪১৮, ফাতাওয়া শামী ৪/২২২, ৫/৪০০, বায়ানুল কুরআন; [সূরা মায়িদা- ৪৪])

মাহফুজুর রহমান
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

১৭২ প্রশ্ন : যেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে একসাথে ক্লাস করে, সেখানে শিক্ষকতা করা বা পড়াশুনা করা যাবে কিনা? যদি হারাম হয়ে থাকে আর যদি সহশিক্ষা ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠান না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা কি করবো?

উত্তর : বালেগ ছেলে-মেয়েদের একত্রে ক্লাস করা বা করানো নাজায়েয ও হারাম; চাই তা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হোক কিংবা মাদরাসা হোক। তাই এমন প্রতিষ্ঠানে যারা পড়ে বা পড়ায় তাদের করণীয় হল, যে কয়দিন থাকবে খুব সতর্কতা অবলম্বন করে তওবা ইস্তিগফারের সাথে থাকবে। আর ছেলে-মেয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজতে থাকবে। পাওয়া মাত্রই সেখানে চলে যাবে।
কখনো যদি সহশিক্ষা ব্যতীত কোন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া নাই যায়, তাহলে শিক্ষক হলে অন্য কোন হালাল পেশা অবলম্বন করবে। আর ছাত্র হলে এই শিক্ষা বাদ দিয়ে দীনী শিক্ষা অর্জন করা শুরু করবে।
(মউসূআতুল আহকাম ওয়াল ফাতাওয়া আশ-শরঈয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১৪৩৪, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ১৩/১৩, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৭০)

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৭৩ প্রশ্ন : (ক) খুতবার সময় লাঠি ব্যবহার করা কি সুন্নাত?
(খ) মিম্বর তৈরির পর খুতবার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাঠি ব্যবহার প্রমাণিত কিনা? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : (ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনভেদে কখনো কখনো খুতবার সময় লাঠি ব্যবহার করতেন। কিন্তু সর্বদা এর উপর আমল করতেন না। সুতরাং খুতবার সময় লাঠি ব্যবহার করা সুন্নাত। কিন্তু সুন্নাতে মাকসূদাহ নয়। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে হাতে লাঠি নিয়ে খুতবা দেয়া জায়েয আছে। আর প্রয়োজন না হলে লাঠি ব্যবহার না করাও জায়েয আছে।
(সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১০৯৬, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ৫২৪৪, ফাতাওয়া শামী ২/১৬৩, ই'লাউস সুনান ৫/৭৫, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহ ২/১৩১৪, ইমদাদুল আহকাম ১/৭৩৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/৬৫, ১৭৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৬৫৩, কিফায়াতুল মুফতী ৩/২১৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৮৬২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৫২৩৮, তারীখুত ত্বাবারী ২/৭)

(খ) খুতবার সময় লাঠি ব্যবহার সংক্রান্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবেয়ীদের থেকে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির মধ্যেও এমন কোন ইঙ্গিত নেই, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মিম্বর তৈরির পর লাঠি ব্যবহার করতেন না। ইবনে শিহাব যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর তৈরির পরও লাঠি ব্যবহার করতেন। হাদীসে এসেছে, (অর্থ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (খুতবার জন্য) দাঁড়াতেন তখন মিম্বরের উপর লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান রাযি.-ও অনুরূপভাবে দাঁড়াতেন। (মারাসীলে আবূ দাউদ; হা.নং ৫৫)
কিন্তু যাদুল মা'আদ (১/৪১৪) ও ফাতাওয়া মাহমূদিয়া (১২/৩৯৮) সহ যে সকল কিতাবে 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর তৈরির পর লাঠি ব্যবহার করতেন না' মর্মে যে বক্তব্য রয়েছে এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।
(মারাসীলে আবূ দাউদ; হা.নং ৫৫, আসারুস সুনান; পৃষ্ঠা ২৮৯, খুবাতুল জুমু'আ ওয়া আহকামুহাল ফিকহিয়্যা; পৃষ্ঠা ২৩৬)

স্মৃতির ছেঁড়াপাতা

ইরফান জিয়া

তিন রাত ধরে জেগে আছি। চেষ্টা করছি লেখার। পারছিনা। স্মৃতিগুলো শুধু ক্রমাগত আঘাত হানছে মনোজগতে। কিন্তু লেখতে বসলেই সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। স্মৃতিগুলো বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো কলমের ডগা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। প্রত্যেকটা স্মৃতিই চাইছে কাগজের পাতায় অঙ্কিত হয়ে থাকতে। কিন্তু উপায় নেই। সব স্মৃতিকে কাগজবন্দী করতে গেলে সময় ও স্থান কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারব না।

হ্যাঁ, বন্ধুগণ! আমাদের তাইসীর থেকে তাকমীলের স্মৃতির কথাই বলছি। এসব স্মৃতির সাথে মিশে আছে কত হাসি, কত কান্না। পরতে পরতে মিশে আছে সুখ-দুঃখের হাজারো উপাখ্যান। স্মৃতির এইসব রঙকে সাদা কাগজে তুলে ধরতে গিয়ে বারবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছি। স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছি বারবার। পাঠক, বুঝতেই পারছেন-এই মুহূর্তে কলমটা সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। তাই পুরো লেখার কোন একটি অংশও যদি আপনার মনোকষ্টের কারণ হয়, কোন একটি বাক্যেও যদি বিচ্যুতি নজরে আসে, আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।

এক.

১৪২৭-২৮ হি.২০০৬-০৭ ঈ.

জামা'আতের নাম তাইসীর

দুই হাজার ছয়। রমজানের ঠিক পরপর। জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার কিতাবখানায় ভর্তি হওয়ার জন্য ছুটে এলো একদল ছাত্র। প্রথম জামা'আতের ভর্তি। পরীক্ষা হলো উর্দূ কায়দা থেকে। কয়েক শ' ছাত্রের মধ্যে নেয়া হলো বাহাত্তর জনকে। আমরা তখন হিফজখানা থেকে মুক্তি পাওয়া পাখি। নতুন জীবন শুরু হলো বিশফুট চওড়া আর আশিফুট লম্বা এক হলরুমে। অনেকগুলো নতুন মুখ। বেশিরভাগই অপরিচিত। দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হলো ছাত্রদের। একেক গ্রুপে ছত্রিশ জন। শুরু হলো আমাদের পথচলা।

কানুনের জামি'আ, জামি'আর কানুন

প্রথমেই কানুন শুনানীর মজলিস। আমরা কয়েকজন এ জামি'আর হিফজখানায় পড়েছি। তাই আগে থেকেই এ মজলিসের সাথে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্রের কাছেই এটা নতুন। রাহমানিয়ায় যারা ভর্তি হতে আসে তারা সাধারণত এর নিয়মের কথা জেনেই আসে। তবু সেই নিয়মগুলো যখন দীর্ঘ চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে শোনানো হয়, তখন কানুনের প্রতি সবার অন্যরকম শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। তবে সেই সাথে কিছুটা ভয়ও লাগে। না জানি কখন কী হয় আর এ জামি'আর অযোগ্য বলে বিবেচিত হই। মনে মনে বলি, হে আল্লাহ যে নে'আমত তুমি দান করেছ তা পূর্ণ না করে ফিরিয়ে নিও না।

ইফতিতাহী মজলিস

কানুন শুনানীর পরের দিন। ঘোষণা হলো, সবক ইফতিতাহের মজলিস হবে। মানে আনুষ্ঠানিকভাবে সবক শুরু হবে। এই মজলিসের মধ্যমণি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ফকীহুল মিল্লাত আব্দুর রহমান সাহেব রহ.।

পরের বছর থেকে সবক ইফতিতাহের জন্য আর কোন মেহমান আসেননি। কারণ আর কিছুই নয়। মাওলানা মাহমূদুল হাসান দা. বা. এ বছরই খতমে বুখারীতে এসেছিলেন। তিনি এসে ঘোষণা দিলেন, আগামী বছর থেকে শুরু এবং শেষের দরস এ জামি'আর মুরব্বীরাই প্রদান করবেন। তাই হলো। এরপর থেকে ইফতিতাহ এবং ইখতিতামে মাঝে মধ্যে কোন মেহমান এসেছেন। কিন্তু দরস প্রদান করেছেন শাইখুল হাদীস মুফতি মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. এবং মুহতামিম মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব দা. বা.। আমাদেরও ভাগ্য খুলে গেলো। মুরব্বীদ্বয়ের অবারিত ফয়েজে আমরা ধন্য হতে লাগলাম।

খুদ্দামুত্তলাবা, বিকশিত আগামীর জন্য...

সবক ইফতিতাহের কয়েকদিন পর। জোহরের পর থেকেই হলরুমে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। উৎসাহী ছাত্ররা কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, আজ খুদ্দামুত্তলাবার পরিচিতি অনুষ্ঠান। আসরের পর। হযরত আবদুল কাইয়ূম আল মাসঊদ সাহেব সুন্দরভাবে খুদ্দামুত্তলাবার অর্থ বললেন। খুদ্দাম মানে সেবক। তলাবা মানে ছাত্র। দুটো মিলে অর্থ দাঁড়ায়, ছাত্রদের সেবক। ছাত্রদের মেধা বিকাশে খুদ্দামুত্তলাবার রয়েছে দশটি বিভাগ। এক এক করে দশ বিভাগের সদস্যদের পরিচিত করা হলো সবার সাথে। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের সামনে উন্মোচিত হলো এক নতুন দিগন্ত। জানতে পারলাম, তা'লীমের সাথেসাথে আরো কত আয়োজন রয়েছে এই রাহমানিয়ায়!

সেই হলরুম

শুরুতেই বলেছিলাম, আমাদের জামা'আতের অবস্থান ছিলো একটা হলরুমে। তাও পুরোটা জুড়ে নয়। এক তৃতীয়াংশে থাকতেন আমাদের এক জামা'আত উপরের কিছু ভাই। প্রতিবেশি হিসাবে সেই জামা'আতের ছাত্ররা ভালোই ছিলেন। তবে কয়েকজন একটু ব্যতিক্রম ছিলেন। সেই কয়েকজনের কারণে আমাদের জামা'আতের বন্ধুরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলো। আসলে সেই বিষয়গুলো ছিলো খুবই সাধারণ। নিতান্তই ছেলেমানুষী। তবু আমাদের ছাত্রদের আবেগী দাবী ছিলো, এর কোন কঠিন সমাধান করা দরকার।

একদিন ঈশার পর। তা'লীমের পর আমাদের এক ভাই দাঁড়ালেন।

বললেন, ছাত্র বন্ধুরা! এই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাদের কাছে আমি দুটো আবদার রাখতে চাই। এক. বড় ভাইদের বাড়াবাড়ির ওপর আমরা ধৈর্যধারণ করব। দুই. আজকের এই মজলিসে ওয়াদাবদ্ধ হব, আগামী বছর যখন আমরা বড় ভাই হব আর আমাদের স্থানে আসবে ছোটরা, তখন তাদের কোন ভুল হলেও আমরা ভালো ব্যবহার করব। কথা শেষ হবার পর চমৎকার এক দৃশ্যের অবতারণা হলো। সবাই হাত তুলে সমর্থন জানালো। চোখে পানি চলে আসার মতো ত্যাগ স্বীকার। যে জামা'আত এতো সহজে ভালো কোন বিষয়ের ওপর একমত হয়, তাদেরকে কেউ কোনদিন ভাঙ্গতে পারবেনা। ইনশাআল্লাহ।

সে বছর আমাদের নিগরান ছিলেন আবূ বকর সাহেব দা.বা. এবং ওয়ায়েস আল-কারনী সাহেব দা.বা.। আবু বকর সাহেব পুরো সময় আমাদের নিগরানীতে নিমগ্ন থাকতেন। হাসি, মজাক, ধমক সব ভাবেই আমাদের ভুলচুক ধরিয়ে দিতেন। আমরাও চেষ্টা করতাম তার দেখানো পথে চলতে। জানিনা, কতটুকু পেরেছি। তবে পরবর্তীতে যখন তার মুখ থেকেই শুনেছি, এই জামা'আতের সাথেই তার হৃদ্যতা সবচে' বেশি, আমাদের দিল তখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। হে আল্লাহ, তুমি তাঁর হৃদয়ের সকল তড়পকে কবুল করো এবং আমাদের এই মহব্বতকে স্থায়ী করো। আমীন।

দুই.
১৪২৮-২৯ হি. ২০০৭-০৮ ঈ.
ধন্য এই মাটি

তাইসীরে আমরা সবাই একই রুমে ছিলাম। মীযান জামা'আতে উঠে আমাদের কেউ কেউ ভিন্ন রুম পেলো। নিগরান হিসাবে পেলাম গাজীপুরী হুজুর এবং ভৈরবী সাহেবকে। বিভিন্ন সময়ে দেশ বিদেশ থেকে মেহমান আসা এটা রাহমানিয়ার আবহমানকালের রীতি। হারদূয়ী হযরত, গওহরপুরী হযরত থেকে শুরু করে অসংখ্য ওলীর পদধূলীতে ধন্য হয়েছে রাহমানিয়ার মাটি। গত বছর এসেছিলেন দেওবন্দের জামীল আহমাদ সাহেব। এবছর এলেন যাকারিয়া রহ. এর মুহতারাম সাহেবযাদা তলহা সাহেব। আরো এলেন দাওয়াত ও তাবলীগের কিংবদন্তী সাবেক পপ তারকা জুনায়েদ জামশেদ। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আরো অনেক মেহমান আগমন করেছেন আমাদের আঙ্গিনায়। তবে রাহমানিয়ার মাটি যে কত বেশি ধন্য, তা বোঝাতে হলে আরো দুই মনীষীর কথা বলতে হবে। একজন শাইখে জামি'আ মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.। অন্যজন মুহতামিমে জামি'আ মাওলানা হিফযুর রহমান দা.বা.। উভয়ই শাহ্ আবরারুল হক রহ. এর অন্যতম খলীফা। প্রতি রবিবার বাদ আসর মুফতী সাহেবের ইসলাহী মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। আর মঙ্গলবার বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয় মুহতামিম সাহেবের মজলিস। আধ্যাত্মিক রওনক ও দবদবার দিক থেকে দু'টি মজলিসই অতুলনীয়। এই দুই মনীষীর ফয়েজে ধন্য আমরা। ধন্য রাহমানিয়ার মাটি।

তিন.
১৪২৯-৩০ হি. ২০০৮-০৯ ঈ.
বাবার ছায়ায় সন্তান

প্রত্যেক মাদরাসাতেই নাকি একজন বাবা হুজুর থাকেন। যিনি সকল ছাত্রকে সন্তানের মতো আগলে রাখেন। অন্য কোন মাদরাসায় আমি পড়িনি। তাই সে সবের খবর আমি বলতে পারবনা। তবে আমাদের জামি'আয় যিনি বাবা বলে প্রসিদ্ধ তাঁর ক্ষেত্রে এই নাম শতভাগ যথার্থ। নাহবেমীর জামা'আতে উঠে আমরা নেগরান হিসাবে পেলাম আমাদের বাবা হযরত মাও. ইবরাহীম হিলাল সাহেবকে। সাথে আব্দুল্লাহ আল কারীম সাহেব। কথিত আছে, বাবা নাকি তার এই 'বাবা' নামটা পছন্দ করেন না। জানিনা, কথাটা কতটুকু সত্য। তবে আমি নিজে কয়েকবার তাঁকে বাবা বলে ডেকেছি। কই, অপছন্দের কোন ভাব তো তাঁর চেহারায় দেখতে পেলাম না।

বাবার অধীনে থাকা সারা বছরের হাজারো স্মৃতি আজো জ্বলজ্বল করছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে তাঁর পাঠদানের চমৎকার ভঙ্গি। তার উসূল ছিলো, ফে'ল এর পর কাসরা দিলে তিন বেত খেতে হবে। হাজিরার সময় লাব্বাইকের বদলে তাকরার-মুতালা'আ-ইজারা করেছি কিনা বলতে হবে। বাবা রাগান্বিত অবস্থায় কখনো প্রহার করতেন না। হাসিমুখে মাপমতো প্রহার করতেন। মাঝে মধ্যে আমাদের অভিমানও হতো। পরক্ষণেই তার আদরের কাছে সব পানি হয়ে যেতো। আরো অনেক স্মৃতি আছে বাবাকে ঘিরে। সব ব্যক্ত করতে পারছিনা। কারণ, এইটুকু লেখেই আবেগে ভরে উঠছে মন। হাহাকার করছে হৃদয়। মনে হচ্ছে, এক্ষুণি যদি বাবা এসে পিঠে ধরাম করে একটা আদরের থাপ্পড় বসিয়ে দেন তাহলে হয়তো বুকটা একটু হালকা হবে। বাবা! আপনার ঋণ কোনদিন শোধ হবে না।

এ বছর রাহমানিয়ার ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় সূচিত হয়। জামি'আর কয়েকজন উস্তাদের উদ্যোগে জামি'আর জন্য জমি কেনার তোড়জোড় শুরু হয়।

চার.
১৪৩০-৩১ হি. ২০০৯-১০ ঈ.
স্বপ্নের পথচলা

আমরা হেদায়েতুন্নাহু জামা'আতে উঠে গেলাম। গত বছর শেষ থেকেই জামি'আর নিজস্ব জমির জন্য ফিকির শুরু হয়েছিলো। এ বছর তার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা শুরু হলো। সর্বপ্রথম আসাতিযায়ে কিরামই এর জন্য নিজেদের অনুদান পেশ করলেন। কয়েকমাস পর জামি'আর সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী সম্মেলন আহ্বান করা হলো। সবার সামনে তুলে ধরা হলো এ নতুন উদ্যোগের কথা। সবশেষে ডাকা হলো জামি'আর সন্তানদের। এই টিনশেড থেকে গেলো দশ বছরে যারা ফারেগ হয়েছেন তাদেরকে দস্তারে ফজীলত প্রদান করা হলো। জামি'আর নিজস্ব জায়গা হবে শুনে তাদের খুশীর সীমা ছাড়িয়ে গেলো।

এভাবেই জামি'আর ছাত্র, শিক্ষক, ফূযালা, শুভাকাঙ্ক্ষী সবাই মিলে সুন্দর এক আগামীর স্বপ্ন দেখতে

লাগলেন। দীর্ঘ দশ বছর যেই স্বপ্ন মনের অচিন কোণে লুকিয়ে ছিল, আজ তার পথ চলা শুরু হলো।

পাঁচ.
১৪৩১-৩২ হি. ২০১০-১১ ঈ.
স্বপ্নপূরণের হাতছানি

জামা'আতে কাফিয়া। নিগরান ছিলেন মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান সাহেব। এবছরের শুরুতেই জামি'আর নিজস্ব জমির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। বসিলা ব্রিজের একটু আগে একটা হাউজিংয়ে প্রায় তিন বিঘা জায়গা কেনা হলো। হাউজিংয়ের নামটাও খুব সুন্দর। স্বপ্নধারা হাউজিং। যেন এ স্থান থেকে উৎসারিত হবে অবারিত স্বপ্নের ধারা। জানতে পারলাম, নতুন কেনা এ জমিতে যে জামি'আ গড়ে উঠবে তার নাম হবে জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া। সবার মনে নতুন স্পন্দন তৈরি হলো। নতুন নামের গুঞ্জণে আলোড়িত হলো সবাই।

কিছুদিন পর। জামি'আতুল আবরারের জমিতে প্রথমবারের মতো মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে মেহমানগন উপস্থিত হলেন। এমনকি অসুস্থ শরীর নিয়ে উপস্থিত হলেন প্রফেসর হামিদুর রহমান সাহেব দা. বা.। সে এক আবেগঘন দৃশ্য। চারদিকে ধূধূ বালি। এরিমাঝে কিছু মুখলিস মানুষের সম্মিলন। মরুপ্রান্তের বুকে ইলমী ওহীর উদ্যান তৈরির দৃঢ় সংকল্প। তাইতো ছাত্র বন্ধুরা গেয়ে ওঠলো, 'শুন্য থেকেই হবে/অনেক বড় হবে/এই জামি'আ সবার মনে স্মরণীয় রবে'। মাহফিলের পর অনেকদিন পর্যন্ত চললো জমিটাকে ঠিকঠাক করার কাজ। টিনের একচালা তৈরী করা হলো জমির দেখাশোনা করার জন্য। কয়েকদিন পর বানানো হলো ছোট্ট দু'টি রুম।

ধীরে ধীরে বছর শেষ হয়ে এলো। কাফিয়ার শেষ দরসের দিন। মুহতারাম হাসান সিদ্দীকুর রহমান সাহেব অনেক কাঁদলেন। আমাদেরও কাঁদালেন। দু'আ দিলেন প্রাণ ভরে। হুজুরের দু'আর প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য হৃদয়ে খোদাই হয়ে রইলো। তারপর হযরত আমাদের সবাইকে একটা করে বই হাদিয়া দিলেন। আমরা সেই বই ঠোঁটে ছোঁয়ালাম, বুকে মেশালাম। আমাদের মতো গোনাহগারদের জন্য এগুলোই তো সম্বল।

ছয়.
১৪৩২-৩৩ হি. ২০১১-১২ ঈ.
আমাদের দিনরাত

দিন গড়িয়ে যায়। দেখতে দেখতে চলে গেলো পাঁচটি বছর। সামনের সময় আরো কত দ্রুত কাটবে কে জানে। যে জামা'আতে এবার উঠেছি, তার নাম শরহে জামী। এখানের পরিভাষায় সানবী আউয়াল। এ বছর রাহমানিয়ার টিনশেডে বড় একটা ঘটনা ঘটলো। পানির জন্য মাদরাসার নিজস্ব মোটর লাগানো হলো। মোটরের নাম সাবমারসিবল। সরাসরি চারশ' ফুট মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন করবে এ মোটর।

পাঠক, অবাক হচ্ছেন? পানির জন্য মোটর লাগানোর বিষয়টাকে এতো বড় করে কেন দেখানো হচ্ছে, বুঝতে পারছেন না? আপনার অবাক হওয়া ঠিকই আছে। কারণ, আমি স্মৃতিচারণ করতে করতে অনেক দূর চলে এসেছি, কিন্তু আপনাকে আমাদের বাসস্থানের সাথে পুরোপুরি পরিচয় করানো হয়নি। বাসস্থান বলতে ছিলো একসারি টিনশেড ঘর। তিন ইঞ্চি ইঁটের দেয়াল। আস্তর ছাড়াই চুন করা। শীতের দিনে প্রচণ্ড শীত। আর গরমের দিনে অসহ্য গরম। বর্ষার সময় টিনের ফুটো দিয়ে অঝোর ধারায় পানি পরা ছিলো খুবই সাধারণ ব্যাপার। মাঝে মাঝে রুমের ভেতর জমা হতো পানি। ছাত্ররা সিট বেডিং বেঞ্চির ওপর তুলে দিয়ে পানি সেচার কাজে লেগে যেতো।

আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করার জন্য সাপ্লাইয়ের পানির ব্যবস্থা ছিলো। একটা মাত্র পাইপ দিয়ে পানি আসতো। আর সেই পানি সাত শ' ছাত্রকে মেপে মেপে ব্যবহার করতে হতো। এর ওপর মাঝে মাঝেই দেখা যেতো পানি আসছে না। দিনের পর দিন কেটে যেতো এই অবস্থায়। ঘেমে অস্থির হয়ে আমরা গোসল করতে চলে যেতাম লালমাটিয়ার পুকরে আবার কখনো অন্য কোন মসজিদের অজুখানায়। ফেরার সময় আবার ঘেমে উঠতো শরীর। অনেক সময় এতো দূরে গিয়ে গোসল করার সময় থাকতো না। তখন আর কী করা, ছাত্ররা দীর্ঘ সময় ব্যয় করে হাউজের নিচে জমে থাকা পানি ওঠাতো। ভাগে পরতো আধা বালতির চেয়েও কম। তারপর সেই পানি গামছা দিয়ে ছেঁকে গোসল করতে হতো। মর্মান্তিক দৃশ্য!

ছয় বছর পর্যন্ত পানির জন্য হাহাকার করে অবশেষে যখন নিজেদের ঘরেই অবারিত পানির ব্যবস্থা হলো, তখন আমাদের মনে হলো বিরাট কোন ঘটনা ঘটে গেছে। তবে বাস্তব কথা হলো, এতসব ত্যাগের মাঝেও আমাদের সবকিছুতে অকৃত্রিম আনন্দ ছিলো, প্রাণ ছিলো আর ছিলো আসাতিযায়ে কেরামের মায়াভরা দৃষ্টি !

সাত.
১৪৩৩-৩৪ হি. ২০১২-১৩ ঈ.
রাবেতার কথা

শরহে বেকায়া। নিগরান হিসাবে এবার তাইসীরের সেই নিগরানকে পেলাম। হযরতের হৃদ্যতার কথা তো আগেই বলেছি। এ বছরও আমরা তাঁর সুনিপুণ পরিচালনা ও হৃদ্যতায় সিক্ত হলাম। অনেকদিন ধরেই দাবী উঠছিল, বিগত সময়ের ফারেগ ছাত্রদের সমন্বয়ে একটি সংগঠন তৈরী করা হোক। এ বছর যারা দাওরায়ে হাদীস পড়েন তাদের উদ্যোগে এটি বাস্তবতা লাভ করে। নাম দেয়া হয়, রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া। রাহমানিয়ার সন্তানদের বন্ধন।

আট.
১৪৩৪-৩৫ হি. ২০১৩-১৪ ঈ.
অস্তাচলের হাতছানি

জালালাইন মানে বড় ভাইদের জামা'আত। জামি'আর বিভিন্ন কাজে যাদের নিত্য তলব করা হয়। এ জামা'আতে উঠেই মনে হতে থাকে, হায়! বেলাতো শেষ হয়ে এল। সাত বছর কেটে গেল কত দ্রুত। বাকি তিন বছর কিভাবে চলে যাবে কে জানে।

মসজিদুল আবরারের পাইলিংয়ের কাজ গত বছরের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল। সেই সাথে শুরু হয়েছিল উন্নতমানের দুটো টিনশেড ঘর তৈরির কাজ। এবছরের শুরুতেই সেই টিনশেড সম্পন্ন হয়ে গেলো। তাখাস্সুসাত এবং হিফ্জবিভাগকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হলো। বছর শেষ হওয়ার আগেই শেষ হল মসজিদের কাজ। এত স্বল্প সময়ে ছ'তলা মসজিদ! কুদরতি ইলাহীর এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। মসজিদের কাজ যখন মোটামোটি ভাবে সম্পন্ন হলো, ঠিক এমন সময় জানা গেলো, রাহমানিয়ার টিনশেডের সামনের রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে। সেই কারণে টিনশেডের অর্ধেকটা ভাঙ্গা পড়বে। জামি'আ কর্তৃপক্ষ প্রাণভরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। সঠিক সময়ে আল্লাহ আমাদের জন্য থাকার জায়াগার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দশ জামা'আতের মধ্য থেকে চার জামা'আতকে দ্রুত মসজিদুল আবরারে পাঠিয়ে দেয়া হল।

নয়.
১৪৩৫-৩৬ হি. ২০১৪-১৫ ঈ.
চাপা পড়া স্মৃতি

লেখার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসছে। তবে স্মৃতির জোয়ার এখানো শেষ হচ্ছে না। কত কিছুই তো মনে আসছে। কিন্তু লেখার সময় ও স্থান দু'টিই স্বল্প। তাই মনের কথা মনেই চাপা দিয়ে সংক্ষেপ করতে হচ্ছে বাক্য।

আমরা এখন মেশকাতে উঠে গেছি। নিগরান হিসেবে পেয়েছি বাবাকে। অপ্রত্যাশিত নিয়ামত। আমাদের দশ বছরের জীবনে এমন খুশি কমই এসেছে। এ যেন বিদায় বেলা স্নেহশীল বাবার শীতল পরশ। সেই পরশে আমাদের দিল খুঁজে পেলো জান্নাতের শীতলতা। এ বছর আমাদের আরেকজন নিগরান ছিলেন, আব্দুল হামীদ খুলনার হুজুর দা.বা.। হুজুরের পরিপাটি জীবন আর সুক্ষ্মতর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সারা জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

এ বছরের শুরুতেই জালালাইন, মেশকাত, দাওরা-এই তিন জামা'আত ছাড়া বাকি সবাইকে পাঠিয়ে দেয়া হলো আবরারে। কয়েকদিন পরই ভাঙ্গা শুরু হলো রাহমানিয়ার টিনশেড। পুরোটা নয়, অর্ধেকটা। হাজারো ছাত্রের অসংখ্য স্মৃতি চাপা পড়ে গেলো ভাঙ্গা টিনশেডের নিচে। ১২০ ফিট রাস্তার গহ্বরে। আমরা ক'জন বাকি থেকে যাওয়া টিনশেড আকড়ে ধরে থাকলাম। আকড়ে ধরে থাকলাম আমাদের অতীত।

দশ.
১৪৩৬-৩৭ হি. ২০১৫-১৬ ঈ.
বেলা শেষে পাখি ফেরে নীড়ে

অবিশ্বাস্যই লাগছে, মোমবাতির মত ফুরিয়ে গেল দশটি বছর। তাইসীরে আমরা ভর্তি হয়েছিলাম বাহাত্তর জন। সেই বাহত্তর জন থেকে আছি ছাব্বিশ জন। তবে এর মধ্যে প্রতি বছর অনেক নতুন সঙ্গীও এসেছে। তাদের সবাইকে নিয়ে এখন তাকমীল জামা'আতে আছি সত্তর জন। তাকমীল মানে পূর্ণাঙ্গ। পুরো মাদরাসার পরিচালক। অথচ আমরা কি পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি। সন্দেহ হয়। তবুও দায়িত্ব এল বিভিন্ন কাজে নেতৃত্ব দেয়ার। খুদ্দামুত্তলাবার পরিচালনার দায়িত্বও কাঁধে চাপলো। নিজেদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও সাহস করে এগুতে হলো। এক সময় খুদ্দামুত্তলাবার সমাপন ঘনিয়ে এল। সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথী হয়ে এলেন বিগত দশ বছরের খুদ্দামুত্তলাবার নায়েবে আমীরগণ। তাদের অভিব্যক্তিতে সিক্ত হল সবার হৃদয়।

মুহতারাম মুফতী সাহেব এ অনুষ্ঠানের বয়ানে বললেন, জামি'আর ছাত্ররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ক. প্রথম শ্রেণী, যারা টিনশেডে ভর্তি হয়েছে আর সেখানের সমস্ত কষ্ট সহ্য করে সেখান থেকেই ফারেগ হয়েছে। খ. দ্বিতীয় শ্রেণী, তারা কিছুদিন টিনশেডে আর কিছুদিন আবরারের ভবনে কাটিয়েছে। গ. তৃতীয় শ্রেণী, যারা আবরারের ভবনে ভর্তি হয়েছে আবার এই ভবন থেকেই ফারেগ হয়ে যাবে। কখনই টিনশেডের কুরবানীর সম্মুখীন হবে না।

মুহাতারাম মুফতী সাহেব প্রথম দুই শ্রেণীর নাম দিলেন 'উশ্শাকে রাহমানিয়া'। অর্থাৎ এই দুই শ্রেণী রাহমানিয়ার আশেক। তবে প্রথম শ্রেণীই অগ্রগামী। আমাদের জামা'আতের সবার দিল থেকে বেরিয়ে এলো আলহামদুলিল্লাহ। আমরা প্রথম শ্রেণীতেই অন্তর্ভূক্ত। কারণ, আমরা কখনই ভবনে থাকিনি। আর সামনের ক'দিনও ভবনে থাকার সম্ভাবনা নেই। প্রথম শ্রেণীর আশেক হতে কার না মনে চায়।

পাঠক! সমাপনী অনুষ্ঠানের কথা তো বললাম। কিন্তু এই সমাপন শব্দের মাধ্যমেই মনে হয় আমাদের আঙ্গিনায় বিদায়ের শেষ ঘন্টিটা বেজে গেলো। চোখের পলকে চলে এলো খতমে বুখারী। তারপর পরীক্ষা। তারপর...? তারপরের কথা কিভাবে লেখব। দেখ, আমার কলম কেমন থরথর করে কাঁপছে। চোখের পানিতে একাকার হচ্ছে স্মৃতির খাতা। যদি পারতাম, হৃদয় চিড়ে দেখাতাম, কী প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে সেখানে। যদি পারতাম সত্তর জন গলার সমস্ত শক্তি একত্র করে চিৎকার দিয়ে সাড়া দুনিয়াকে জানিয়ে দিতাম-

এই মাটিকে ছুঁয়ে দেখি এটাই আমার ঘর
আমায় যেন এই জামি'আ করেনাকো পর।
এত সুখের বাঁধন ছিড়ে দুঃখ
অবসাদের ভীড়ে পাব কোথায় ঠাঁই,
আমার সারা জনম ভরে আসাতিযার
বাহুডোরে থাকতে আমি চাই।
কিয়মত তক রাহমানিয়ার হয়না যেন ক্ষয়,
কিয়মত তক আবরারিয়ার হয়না যেন ক্ষয়!

লেখক : শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া, ঢাকা